জিম করবেট

# জঙ্গলের আইন

রুপান্তর: ইশিয়াক হাসান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

# জঙ্গলের আইন

মূল: জিম করবেট

রূপান্তর: ইশতিয়াক হাসান

প্রথম প্রকাশ: ২০১০

## কানওয়ার সিং

চাঁদনি চক গ্রামের মোড়ল কানওয়ার সিং জাতিতে একজন ঠাকুর। সে মোড়ল হিসেবে ভাল না খারাপ তা জিম করবেটের জানা নেই। তবে তিনি তাকে পছন্দ করতেন দুটো কারণে। প্রথমত, সে কালাধুনির সেরা পোচার; দ্বিতীয়ত, করবেটের ছোটবেলার নায়ক তাঁর বড় ভাই টমের একজন অনুভক্ত সে।

কানওয়ার সিং টমের অনেক শিকার অভিযানে তাঁর সঙ্গী হয়েছে। কাজেই টমের অনেক গল্প তার থলিতে জমা আছে, তবে যে গল্পটা করবেট সবচেয়ে পছন্দ করেন, এমনকী বার বার শুনেও ক্লান্ত হন না, তা টম এবং এলিস নামের এক লোকের মধ্যকার আকস্মিক এক প্রতিযোগিতাকে নিয়ে। এই লোককেই এক পয়েন্টের ব্যবধানে হারিয়ে গত বছর টম ভারতের সেরা রাইফেল শটের পুরস্কার বি. পি. আর. এ স্বর্ণপদক জিতে নিয়েছেন।

টম আর এলিস, পরস্পরের অজান্তে গারুপ্পুর কাছে একই জঙ্গলে শিকার করছিলেন। একদিন সকালে কুয়াশা কেবল যখন গাছের মাথায় উঠেছে, জঙ্গলের উঁচু একটা জায়গার দিকে যাবার সময় তাদের দেখা হয়ে গেল। সেখান থেকে নীচের বিশাল এলাকাটা দেখা যায়, সেখানে সকালের এই সময়টায় হরিণ আর ওয়োরের দেখা পাওয়া যায়। কানওয়ার সিং যথারীতি টমের সঙ্গে ছিল, আর এলিসের সঙ্গী বুদ্ধু নামের নৈনিতালের এক শিকারী। তার নিচু জাত আর জঙ্গলের সাথে সম্পর্ক আছে এমন সব বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে কানওয়ার সিং তাকে মোটেই পাত্তা দিত না। স্বাভাবিক কুশল বিনিময়ের পর এলিস টমকে জানালেন, মাত্র এক পয়েন্টের দুঃখজনক ব্যবধানে তিনি যদিও তাঁকে সেবার হারিয়ে দিয়েছেন, এবার দেখিয়ে দেবেন বুনো প্রাণী শিকারে তিনি টমের চেয়ে দক্ষ। তারপর পরামর্শ দিল বিষয়টা প্রমাণের জন্য তাদের দু'জনের প্রত্যেকে দুটো করে গুলি করার সুযোগ পাবেন।

লটারি হয়ে গেল। জিতলেন এলিস: তিনি আগে গুলি ছোঁড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, খুব সাবধানে এবার তারা নিচু জমিটার দিকে এগুলেন। এলিসের হাতে একটা .৪৫০ মার্টিনি-হেনেরি রাইফেল, এটা নিয়েই তিনি বি. পি. আর. এ.

www.BanglaBook.org

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে টমের অস্ত্রটা ওয়েস্টলি রিচার্ডসের .৪০০ ডি. বি এক্সপ্রেস। রাইফেলটা নিয়ে টম বেশ গর্বিত; অল্প কয়েক দিন আগে মাত্র এমন কিছু অস্ত্র ইন্ডিয়ায় এসে পৌঁছেছে।

বাতাস সম্ভবত তাঁদের দিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে, কিংবা অসতর্ক ভাবে এগিয়েছেন তাঁরা যাই হোক, উঁচু জায়গাটার চূড়ায় পৌঁছে নীচে একটা বন্যপ্রাণীও দেখতে পেলেন না প্রতিযোগীরা। নিচু জায়গাটার কাছের প্রান্তে এক ফালি শুকনো ঘাসের পিছনে বেশ কিছুটা ঘাস আগুনে পুড়ে গেছে। নতুন চারা উঠতে শুরু করায় এখন এই পোড়া জমিটা আবার সবুজ হতে শুরু করেছে। আর এখানেই সকাল সন্ধ্যা দু'বেলায়ই বন্যপ্রাণীদের দেখা পাওয়া যায়। কানওয়ার সিং মত প্রকাশ করল, কিছু প্রাণী শুকনো ঘাসের জঙ্গলটার ভিতর লুকিয়ে থাকতে পারে। তারপর তার বুদ্ধিমত সে আর বুদ্ধু জায়গাটায় আগুন লাগিয়ে দিল।

ঘাসগুলো আগুনের শিখায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিছু আর স্টার্লিং পাখির দল আগুনের আঁচ থেকে পালানোর জন্য উড়তে শুরু করা ঘাস ফড়িংগুলোকে খাবার জন্য জায়গাটার চারপাশে ভিড় জমাতে শুরু করেছে। তখনই ঘাসের জঙ্গলটার অন্য প্রান্তে একটা নড়াচড়া দেখা গেল। প্রায় সাথে সাথে বিশাল দুটো শুয়োর তিনশো গজ দূরের বড় জঙ্গলটায় আশ্রয় নেবার জন্য পোড়া জমিটার মধ্য দিয়ে ছুটতে শুরু করলেন। এলিস তার চোদ্দ স্টোন ওজনের বিশাল শরীরটা নিয়ে ধীর-স্থির ভাবে হাঁটু গেড়ে বসল এবং রাইফেল তুলে পিছনের প্রাণীটার দিকে একটা বুলেট পাঠিয়ে দিল। যা কেবল ওটার পিছনের দু'পায়ের মাঝখানে কিছু ধুলো ওড়াল; রাইফেলটা নিচু করে এলিস দুশো গজ দূরে নিশানা করলেন। এবার রাইফেলের খালি কার্তুজটা ফেলে নতুন একটা কার্তুজ ঢুকিয়ে গুলি করলেন। প্রায় সাথে সাথেই দ্বিতীয় শুয়োরটা সামনের জমিটা ধুলোর মেঘে ঢেকে গেল। আবার তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন।

এই দ্বিতীয় গুলিটা শুয়োরগুলোকে রাইফেলের কাছ থেকে আরও দূরে, ডান দিকে সরিয়ে দিল। এগুলোর দৌড়ানোর গতিও বেড়ে গেছে।

এবার টমের পালা। তাঁকে তাড়াতাড়ি গুলি করতে হবে। কারণ শুয়োরগুলো দ্রুত সামনের জঙ্গলের দিকে ছুটছে, যে কোনও সময় রাইফেলের আওতার বাইরে চলে যাবে। টম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রাইফেলটা তুললেন, এবং এগুলোকে লক্ষ্য করে পর পর দুটি গুলি ছুঁড়লেন। দুটো গুলিই মাথায় আঘাত হানল। শুয়োর দুটো এমন ভাবে মাটিতে পড়ল যেন দুটো খরগোশ পড়ল।

কানওয়ার সিং মুখস্থ বুলির মত আউড়ে যাওয়া তার এই গল্পটা শেষ করে সব সময় এভাবে, 'তারপর আমি বুদ্ধুর দিকে ফিরলাম। নিচু জাতের এক লোকের ছেলে, যার তেল চিটচিটে চুলের গন্ধ আমার মেজাজ সবসময় চড়িয়ে দেয়, এবং

www.BanglaBook.org

বললাম, "তুমিই কি সেই লোক নও যে দম্ভ করে বলেছিলে তোমার সাহেব আমাকে শিখিয়ে দিতে পারবে কীভাবে গুলি ছুঁড়তে হয়। আমার সাহেব যদি তোমাদের মুখটা আরও কালো করে দিতে চাইত তবে তার দুটো গুলির প্রয়োজন হত না। এক গুলিতেই সে দুটো শুয়োরকে মেরে ফেলতে পারত"।'

কানওয়ার সিং কখনও করবেটকে বলেনি কীভাবে এটা সম্ভব হত; তিনিও জিজ্ঞেস করেননি।

তার গুরুর প্রতি করবেটের বিশ্বাস খুবই প্রবল। তাঁর ধারণা, সে যদি চাইত তবে এক বুলেটে শুয়োর দুটোকে মেরে ফেলতে পারত!

করবেটের হাতে যখন প্রথম বন্দুক তুলে দেয়া হয়, সে দিনগুলোতে কানওয়ার সিং-ই প্রথম তাঁর কাছে আসত। সে আসত সকালে। তিনি যখন প্রচণ্ড গর্বের সাথে তার দুই ব্যারেলের মাজল লোডার পান্‌টা তার হাতে তুলে দিতেন, কখনও এমনকী চোখের ভাষার মাধ্যমেও বুঝতে দিত না যে বন্দুকের ডান ব্যারেলের ভাঙা অংশটা এবং বাকী অংশের সাথে পিতলের তার দিয়ে ব্যারেলটাকে যে জোড়া লাগানো হয়েছে এটা বুঝে ফেলেছে সে। কেবল এটার বাম ব্যারেলের গুণের কথা বলত সে। বন্দুকটার দৈর্ঘ্য, গুরুত্ব আর কত বছর ধরে এটা সেবা করে চলেছে তার প্রশংসা করে যেত। তারপর বন্দুকটাকে এক পাশে সরিয়ে রেখে করবেটের দিকে ফিরত। তার আট বছরের মনটাকে আনন্দে ভরিয়ে দিয়ে, তাকে দ্বিগুণ গর্বিত করে বলত, সে আর এখন একজন বালক নয়, একজন পুরুষ। চমৎকার এই বন্দুকটা নিয়ে তাদের জঙ্গলের যে-কোনও জায়গাতেই তিনি যেতে পারেন। তবে কোনও পরিস্থিতিতে ভয় পেলে চলবে না। আর তাকে অবশ্যই গাছে চড়াটা শিখে নিতে হবে। তারপর জঙ্গলে যারা চলাফেরা করে তাদের জন্য গাছে চড়তে পারা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝানোর জন্য করবেটকে একটা গল্প বলতে শুরু করে কানওয়ার সিং।

গত এপ্রিলে একদিন হার সিং আর সে একত্রে শিকারে বের হয়। গ্রাম ছেড়ে বের হবার সাথে সাথেই বাধে বিপত্তি: একটা শিয়াল হঠাৎ করেই তারা যে পথ দিয়ে যাচ্ছে সেটার সামনে দিয়ে চলে গেল। হার সিং, করবেট যাকে চেনেন, এমন এক দুর্ভাগা শিকারী যার জঙ্গলে প্রচলিত গল্প সম্পর্কে ধারণা নেই বললেই চলে। অতএব শিয়ালটা দেখার পর কানওয়ার সিং যখন পরামর্শ দিল শিকারের চিন্তা বাদ দিয়ে তাদের গ্রামে ফিরে যাওয়া উচিত, তখন সে তার দিকে তাকিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বলল, একটা শিয়াল তাদের জন্য দুর্ভাগ্য ডেকে আনবে এটা একটা ছেলেমানুষি কথা। সুতরাং তারা আবার এগুতে লাগল। আকাশে তারাগুলোর দ্যুতি যখন আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে আসছে, তখন তারা যাত্রা শুরু করেছে। আর এখন গারুপ্পুর কাছে এসে কানওয়ার সিং একটা পুরুষ

www.BanglaBook.org

চিত্রলকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। এবং আশ্চর্যজনকভাবে গুলিটা ওটার গায়ে লাগল না। একটু পর হার সিং একটা ময়ূরের পাখা ভেঙে দিল। কিন্তু প্রচণ্ড জোরে তাড়া করার পরেও ধরা গেল না, লম্বা ঘাসের জঙ্গলের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল ময়ূরটা। অনেক চেষ্টা করেও আর ওটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। তারপর দীর্ঘ সময় পুরো জঙ্গল চিরুনির মত অভিযান চালিয়ে তারা গুলি করার জন্য একটা প্রাণীও খুঁজে পেল না। অতএব সন্ধ্যার ঠিক আগে তারা গ্রামের পথ ধরল।

বনরক্ষীরা গুলি দুটোর শব্দ শুনতে পেয়েছে, এখন তাদেরকে খুঁজছে সবাই, এই ভয়ে মূল পথ এড়িয়ে ঘন ঝোপ-জঙ্গল আর কাঁটা-বাঁশের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া বালুময় একটা নালা পথ ধরে তারা ফিরছে। নিজেদের মন্দ ভাগ্যের কথা আলোচনা করতে করতে এগুচ্ছে, তখনই হঠাৎ একটা বাঘ জঙ্গল থেকে নালার মাঝখানে উদয় হলো। প্রায় মিনিট খানেক স্থির ভাবে নালার উপর দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল ওটা। তারপর ঘুরে যে পথে এসেছে সে পথে চলে গেল।

বেশ কিছুটা সময় অপেক্ষা করে দুজনে আবার হাঁটতে শুরু করল। এবং তখন বাঘটা আবার নালায় নেমে এসেছে। দাঁড়িয়ে থেকে একদৃষ্টিতে তাদের দেখার পাশাপাশি ওটা এখন গজরাচ্ছে আর লেজ মোচড়াচ্ছে। কানওয়ার সিং আর তার সঙ্গী আবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে বাঘটা শান্ত হয়ে গেল এবং নালা ছেড়ে চলে গেল। একটু পরে সামনের ঘন ঝোপের ভিতর থেকে কয়েকটা বন মোরগ ডাকতে শুরু করল—কক! কক! কক! সন্দেহ নেই বাঘের উপস্থিতিতে আতঙ্কিত হয়ে এগুলো ডাকছে। তারপর একটা উড়ে এসে তাদের সামনের একটা গাছে বসল। মোরগটা যে ডালটায় বসেছে সেটা এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। হার সিং মত প্রকাশ করল, এটাকে গুলি করে অন্তত খালি হাতে গ্রামে ফিরার লজ্জা থেকে তারা রেহাই পেতে পারে। তা ছাড়া, গুলির শব্দে ভয় পেয়ে বাঘটাও পালাবে। কানওয়ার সিং তাকে থামাবার আগেই সে গুলি করে বসল।

পরমুহূর্তে সামনের ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কলজে কাঁপানো গর্জন করতে করতে বাঘটা তাদের দিকে ছুটে আসবার শব্দ শোনা গেল। তাদের কাছ থেকে একটু দূরে নালার কিনারায় কয়েকটা ঝুনি গাছ জন্মেছে। কানওয়ার সিং এগুলোর একটার দিকে, আর হার সিং অপর একটার দিকে দৌড়াতে শুরু করল। কানওয়ার সিং-এর গাছটা বাঘের কাছে হলেও, ওটা পৌঁছার আগেই সে নালার বাইরে গাছের উঁচু একটা ডালে চড়ে বসল। কিন্তু হার সিং তার মত বালক বয়সেই গাছে চড়াটা রপ্ত করে নেয়নি। সে এখনও গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে, একটা ডালকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এদিকে বাঘটা কানওয়ার সিংকে

www.BanglaBook.org

ধরার চিন্তা বন্ধ দিয়ে তার দিকে লাফ দিল। কিন্তু এটা হার সিংকে কামড়াল না, কিংবা আঁচড় দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলল না। বরং আশ্চর্যজনকভাবে তাকে সহ গাছটাকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরল যে তার আর নড়াচড়া করার উপায় থাকল না : তারপর নখ দিয়ে গাছের অপর প্রান্তের ছাল, বাকল প্রচণ্ড আক্রোশে চিরে ফালাফালা করল। ওটা যখন এই কাজে ব্যস্ত, হার সিং তখন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে : বাঘটাও থেমে নেই, ওটাও গর্জন ছাড়ছে। কানওয়ার সিং গাছে ওঠার সময় তার বন্দুকটা সঙ্গে নিয়ে উঠেছে। এবার পায়ের উপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সে বন্দুকের হ্যামার টেনে দিল এবং শূন্যে গুলি করল। এত কাছ থেকে গুলির প্রচণ্ড শব্দ শুনে আতঙ্কিত বাঘটা হার সিংকে ছেড়ে ছুটে পালাল। হার সিং-এর দেহটা ভাঁজ হয়ে গাছের নীচে পড়ে রইল।

বাঘটা চলে যাওয়ার একটু পরে কানওয়ার সিং কোনও শব্দ না করে আস্তে আস্তে গাছটা থেকে নেমে আসল। হার সিং-এর কাছে এসে সে আবিষ্কার করল বাঘটার একটা নখ তার পেটের ভিতর ঢুকে পাঁজরার কাছ থেকে মেরুদণ্ডের আগ পর্যন্ত চিরে দিয়েছে। ফলে তার ভিতরের সমস্ত নাড়িভুঁড়ি বাইরে বের হয়ে এসেছে। কানওয়ার সিং এবার ভয়ঙ্কর বিপদে পড়ে গেল। সে কোনওভাবে হার সিংকে এখানে রেখে চলে যেতে পারে না, আবার এ ধরনের পরিস্থিতিতে কী করা উচিত এ বিষয়েও তার কোনও ধারণা নেই : জানা নেই পুরো জিনিসটা কি আবার পেটের ভিতর ঢুকিয়ে দিতে হবে, নাকি এগুলো কেটে ফেলে দেয়াটাই ভাল হবে। তাদের কথা শুনে পাছে বাঘটা আবার ফিরে এসে তাদের মেরে ফেলে, এই ভয়ে সে ফিসফিস করে বিষয়টা নিয়ে হার সিং-এর সাথে পরামর্শ করতে লাগল। হার সিং মত প্রকাশ করল তার ভিতরের জিনিসগুলো আবার পেটেই ফিরে যাওয়া উচিত। অতএব কানওয়ার সিং বাইরে বের হয়ে আসা সমস্ত নাড়িভুঁড়ি, এমনকী এগুলোর সাথে লেগে থাকা গাছের শুকনো পাতা, ঘাস সহ ঠেসে তার পেটের ভিতর ঢুকিয়ে দিল। তার ভিতরের জিনিসগুলো যেন আবার বের হয়ে আসতে না পারে সেজন্য হার সিং-এর পেটটা নিজের পাগড়ী দিয়ে ভাল করে কষে বেঁধে দিল : এবং সাত মাইল পথ পাড়ি দিয়ে গ্রামে পৌঁছার জন্য রওয়ানা হলো। দুটো রাইফেল সাথে নিয়ে কানওয়ার সিং সামনে, আর তার সঙ্গী পিছনে।

তাদের খুব আস্তে আস্তে এগুতে হচ্ছে, কারণ হার সিংকে পাগড়িটা জায়গামত ধরে রাখতে বেশ কসরৎ করতে হচ্ছে। ফলে পথেই রাত নেমে আসল। এসময় হার সিং বলল, গ্রামে ফিরে যাবার চেয়ে কালাধুঙ্গির হাসপাতালে যাওয়াটা তার জন্য ভাল হবে অতএব কানওয়ার সিং রাইফেল দুটো ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখল এবং তারা হাসপাতালের দিকে তিন মাইল অতিরিক্ত পথ অতিক্রমের জন্য রওয়ানা হলো। যখন পৌঁছাল তখন হাসপাতাল বন্ধ হয়ে গেছে।

www.BanglaBook.org

তবে হাসপাতালের কাছেই বাস করেন ডাক্তার বাবু। তখনও জেগে আছেন তিনি। পুরো ঘটনাটা শোনার পর তিনি কানওয়ার সিংকে তামাক বিক্রেতা আলাদিয়াকে ডেকে আনতে পাঠালেন এবং একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে হার সিংকে নিয়ে হাসপাতালের কুঁড়েতে চলে আসলেন। আলাদিয়ার আর একটি পরিচয় হলো, সে কালাধুঙ্গির পোস্টমাস্টার। এজন্য সরকারের কাছ থেকে প্রতি মাসে পাঁচ রূপী করে বেতন পায়। আলাদিয়া পৌঁছার পর ডাক্তার হার সিংকে দড়ির একটা বিছানায় শুইয়ে দিল। আলাদিয়া যখন লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরেছে এবং কানওয়ার সিং যখন হারসিং এর দুই টুকরো মাংসকে এক করে চেপে ধরে রাখল, ডাক্তার তখন তার পেটের ছিদ্রটা সেলাই করে দিলেন। ডাক্তার সবসময়ই এখানকার মানুষজনের কাছে দয়ালু হিসাবে পরিচিত। কানওয়ার সিং-এর দেয়া দুই টাকা নিতেও রাজি হলেন না। বরং পেটের ব্যথা ভুলে থাকার জন্য হারসিংকে চমৎকার একটা ওষুধ খেতে দিলেন।

তারা গ্রামে ফিরে এসে আবিষ্কার করল, জঙ্গলে ডাকাতের হাতে কিংবা বন্যপ্রাণীর হাতে মারা পড়েছে ধরে নিয়ে তাদের স্ত্রীরা ইতিমধ্যে কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে।

গল্প শেষ হতে কানওয়ার সিং কর্নেলকে বলল, 'এবার নিশ্চয় সাহেব বুঝতে পারছেন, যারা জঙ্গলে শিকার করতে যায় তাদের জন্য গাছে চড়তে শেখা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। হার সিং যখন ছোট ছিল তখন যদি কেউ তাকে এ বিষয়টা জানাত, তবে তাদের সেদিন এমন চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হত না।

শিকার জীবনের প্রথম দিককার দিনগুলোতে করবেট যখন পুরানো মাজল লোডার বন্দুকটা নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন, তখন কানওয়ার সিং-এর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছেন। এর মধ্যে একটি হলো মনের মধ্যে জঙ্গলের ম্যাপ তৈরি করা, যে জঙ্গলে তাঁরা শিকার করতেন তার শত শত বর্গমাইল এলাকার

---

* তাদের যে আক্রমণ করেছিল সেটা একটা বাঘিনী। এ এলাকার কোথাও সবেমাত্র এটা বাচ্চা দিয়েছিল, আর এ কারণেই তাদের দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আর এটা রুনি গাছটার সাথে হার সিংকে চেপে ধরে এতটা ভয়ঙ্করভাবে গাছটাকে আঁচড়াতে শুরু করে যে আঠারো ইঞ্চি চওড়া গাছটার তিন ভাগের এক ভাগই চিরে ফালাফালা হয়ে যায়। এই ঘটনার পর থেকে গারুপ্পুর জঙ্গলে শিকার করতে আসা মানুষ আর পোচারদের কাছে পথ সনাক্তকারী চিহ্ন হিসাবে ওটা ব্যবহার হতে শুরু করে। পঁচিশ বছর পরে বনের দাবানলে জ্বলে যাবার আগে পর্যন্ত গাছটা এভাবে অসংখ্য মানুষকে বনে পথ চিনতে সাহায্য করেছে।

ডাক্তার, পোস্টমাস্টার আর কানওয়ার সিং-এর কর্কশ আর হাতুড়ে চিকিৎসা এবং নিজের পেটের ভেতর দিয়ে বেড়ানো গাছের পাতা, ঘাস-এর কারণে হার সিংকে ভবিষ্যতে কোনও সমস্যায় পড়তে হয়নি। বুড়ো হয়ে স্বাভাবিক নিয়মেই সে মারা যায়।

www.BanglaBook.org

মধ্যে পাকা রাস্তা ছিল মোটে একটা। তাঁরা কখনও কখনও এক সাথে শিকারে বের হলেও, অনেক সময়ই করবেটকে একা শিকার করতে হত। কারণ কানওয়ার সিং-এর মনে জঙ্গলের ডাকাতদের সম্পর্কে প্রচণ্ড একটা ভয় কাজ করায় অনেক সময় সপ্তাহের পর সপ্তাহ গ্রাম থেকে বের হত না সে। তার গ্রামটা করবেটদের বাড়ি থেকে মাইল তিনেক দূরে জঙ্গলের ধারে। এমন ঘটনা অসংখ্যবার ঘটেছে—শিকার থেকে ফিরে করবেট কানওয়ার সিং-এর গ্রামে দৌড়ে গেছেন, তিনি চিতল বা একটা পুরুষ সম্বর কিংবা বড় একটা শুয়োর মেরেছেন, সেটা তাঁকে জানাতে এবং চামড়াটা ছাড়িয়ে দিতে বলতে।

শিকার করা প্রাণীটাকে শকুনের হাত থেকে বাঁচাতে খুব সতর্কতার সাথে দুর্ভেদ্য গাছের জঙ্গল ঝোপ কিংবা গুল্মের মধ্যে যেখানেই লুকিয়ে রাখেন না কেন ওটাকে খুঁজে বের করতে আর চামড়া ছাড়াতে তার ভুল হয়নি : প্রত্যেকটি বিশেষ বিশেষ গাছের, প্রতিটি ওয়াটার হোল, নালা আর প্রত্যেকটি জীবই চলাচলের পথের তাদের দেয়া নিজস্ব নাম ছিল। প্রতিটি দূরত্ব তাঁরা হিসাব করতেন করবেটের মাজল লোডার বন্দুক থেকে বের হওয়া গুলির কাল্পনিক একটা পথ ধরে, আর চলাচলের প্রতিটি দিক চিহ্নিত করতেন কম্পাসের চার বিন্দু ধরে। করবেট যখন কোনও শিকার লুকিয়ে রাখতেন কিংবা কানওয়ার সিং কোনও গাছের উপর শকুনের দলকে ছোঁ হতে দেখে সন্দেহ করত একটা চিতাবাঘ কিংবা বাঘ কোনও প্রাণী শিকার করেছে, তখন জায়গাটা চিহ্নিত করতে তাদের বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হবে না এমন আত্মবিশ্বাস নিয়েই সে কিংবা করবেট জঙ্গলে বের হত। দিনের বা রাতের যে সময়ই হোক না কেন, এতে তাদের কোনও সমস্যা হত না।

স্কুল ছাড়ার পর করবেট যখন পশ্চিমবাংলায় কাজ শুরু করলেন তখন বছরে কেবল একবার তিন সপ্তাহের জন্য কালাধুঙ্গিতে আসতে পারতেন। এমন এক বার্ষিক ছুটিতে কালাধুঙ্গি এসে প্রচণ্ড হতাশা নিয়ে আবিষ্কার করলেন তাঁর পুরনো বন্ধু কানওয়ার সিংকে তাদের পাহাড়ের অভিশাপ আফিমের নেশায় ধরেছে। একবার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ার পর ভয়ঙ্কর এই নেশাটা তাকে পেয়ে বসে। অবশ্য সে বার বার করবেটকে এই বলে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, নেশাটা সে দীর্ঘদিন চালিয়ে যাবে না। তবে তার দেয়া এই প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও এক ফেব্রুয়ারিতে কালাধুঙ্গি পৌঁছে গ্রামের লোকদের কাছে যখন শুনলেন কানওয়ার সিং মারাত্মক অসুস্থ, খুব একটা ভাল হলেন না করবেট। তাঁর আসার সংবাদ সেদিন রাতেই কালাধুঙ্গিতে ছড়িয়ে পড়ল। পরের দিন কানওয়ার সিং-এর ছোট ছেলে আঠারো বছরের এক তরুণ প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে তাঁর কাছে হাজির হলো। সে জানাল তার বাবা মৃত্যু শয্যায়। মারা যাওয়ার আগে শেষ বারের মত

www.BanglaBook.org

সে করবেটকে দেখতে চেয়েছে।

চাঁদনি চক গ্রামের মোড়ল কানওয়ার সিং যে জমির খাজনা বাবদ প্রতি বছর সরকারকে চার হাজার রূপি পরিশোধ করে, নিঃসন্দেহে এলাকার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, স্লেট পাথরের ছাদের বিশাল পাথরের বাড়িটাতে তার সঙ্গ উপভোগের জন্য করবেট অসংখ্যবার এসেছেন। তিনি যখন ছেলেটার সঙ্গে গ্রামে পৌঁছালেন তখন তাঁর কানে মহিলাদের কান্না ভেসে এল। তবে কান্নার শব্দ আসছে মূল বাড়ি থেকে নয়, ছোট্ট এক কামরার কুঁড়েটা থেকে : ওটা সে তার এক চাকরের জন্য তৈরি করেছিল। ছেলেটা তাকে কুঁড়েটার দিকে নিয়ে যেতে যেতে জানাল, নাতি-নাতনীদের চিৎকার-চেঁচামেচিতে ঘুম না হওয়ায় তার বাবা এ ঘরে থাকছেন। তাদেরকে আসতে দেখে কানওয়ার সিং-এর বড় ছেলে কুঁড়ে থেকে বের হয়ে এসে জানাল, তার বাবা অজ্ঞান হয়ে গেছে : আর মাত্র কয়েক মিনিট আয়ু আছে তার।

করবেট কুঁড়ের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কুঁড়ের ভেতর আলো এমনিতেই কম; পুরো ঘরে ছড়িয়ে পড়া একটা ধোঁয়ার পর্দা ভেতরটাকে আরও অস্পষ্ট আর ধোঁয়াটে করে তুলেছে। এক সময় তাঁর চোখ এই ঝাপসা আলোতে অভ্যস্ত হয়ে আসল, দেখলেন কানওয়ার সিং ঘরের মেঝেতে শুয়ে আছে, নগ্ন, তবে একটা কাপড় শরীরের অংশবিশেষ ঢেকে রেখেছে। পাশে মেঝেতে বসে থাকা একজন বৃদ্ধ তার নিস্তেজ ডান হাতটা ধরে রেখেছে এবং তার আঙুলগুলো একটা গরুর লেজ ধরে আছে। মরতে বসা একজন মানুষের গরুর লেজ, বিশেষ করে কালো বকনা বাছুরের লেজ ধরার এই প্রথা এসেছে হিন্দুদের একটা প্রচলিত বিশ্বাস থেকে। এতে বলা হয়, আত্মা যখন মাটির শরীর ছেড়ে বের হয়ে আসে তখন রক্তের একটা নদীর বাধার মুখে পড়ে। নদীর শেষ প্রান্তে বসে থাকে একজন বিচারকও, যার কাছে আত্মাকে অবশ্যই তার জীবনের সমস্ত কাজের হিসাব দিতে হয়। আর বাছুরের লেজই একমাত্র পথ যা ধরে পলায়নরত আত্মা রক্তের নদী পাড় হতে পারে। কিন্তু কোনও কারণে যদি আত্মাকে রক্তের নদী অতিক্রমের ব্যবস্থা না করে দেয়া হয় তবে তাকে এই পৃথিবীতেই থেকে কষ্ট ভোগ করতে হয়। আর তখন যারা তাকে বিচারকের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দিতে ব্যর্থ হয়েছে তাদের উপর প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং নানা ভাবে তাদের যন্ত্রণা দিতে থাকে।

কানওয়ার সিং-এর মাথার কাছে একটা তাওয়ায় গোবরের আস্তর পোড়ানো হচ্ছে, পাশে বসে থাকা পুরোহিত সুর করে মন্ত্র আউড়াচ্ছেন, আর একটা ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছেন। পুরুষ আর মহিলাদের ভিড়ে কুঁড়ের মধ্যে এক ইঞ্চি জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ : মহিলারা চিৎকার করে কাঁদছে, আর বার বার আউড়ে যাচ্ছে 'সে মারা যাচ্ছে! সে মারা যাচ্ছে!'

www.BanglaBook.org

করবেট জানেন ভারতে প্রতিদিন এভাবে প্রচুর মানুষ মারা যায়। কিন্তু তিনি তাঁর বন্ধুকে তাদের একজন হতে দিতে পারেন না; সত্যি বলতে কী, তিনি সাহায্য করলে কানওয়ার সিং নাও মরতে পারে। অন্তত এখনই না। দ্রুত পায়ে ঘরটায় ঢুকে পড়ে লোহার তাওয়াটা তুলে নিলেন করবেট। যতটা আশা করেছেন এটা তার চেয়ে গরম হয়ে আছে, তাঁর হাত পুড়ে গেল। তবে করবেটের এখন এদিকে খেয়াল দেওয়ার সময় নেই। তাওয়াটা হাতে নিয়ে দরজার কাছে এসে বাইরে ছুঁড়ে ফেললেন তিনি। তারপর গাছের লতার যে কালো দড়িটা দিয়ে বাছুরটা বাঁধা ছিল সেটা কেটে প্রাণীটাকে বাইরে তাড়িয়ে দিলেন। করবেট এই কাজগুলো করছেন নিঃশব্দে, এবং এর প্রভাব কুঁড়েতে জড়ো হওয়া পুরুষ আর মহিলাদের উপরও পড়ল। তাদের হৈচৈ আর চিৎকার চেঁচামেচি আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে আসছে। তিনি যখন পুরোহিতের হাতটা ধরে তাকে কুঁড়ে থেকে বের করে নিয়ে আসলেন তখন শব্দটা একেবারে থেমে গেল। তারপর ভেতরের প্রত্যেকটি মানুষকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন তিনি। বিনা প্রতিবাদে নির্দেশটা পালন করল তারা। এবার কানওয়ার সিং-এর বড় ছেলেকে যত দ্রুত সম্ভব দুই সের দুধ গরম করে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে বললেন। ছেলেটা প্রচণ্ড বিস্ময় নিয়ে করবেটের দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু নির্দেশটা যখন আবার দিলেন তখন দ্রুত কাজটা করার জন্য বের হয়ে গেল। আবার কুঁড়েতে ঢুকে করবেট দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে রাখা একটা দড়ির খাটিয়াকে টেনে সামনে নিয়ে আসলেন। তারপর তাকে মেঝে থেকে তুলে খাটিয়াটায় শুইয়ে দিলেন। এখন কানওয়ার সিং-এর প্রয়োজন প্রচুর মুক্ত বাতাস।

করবেট দ্রুত ঘরের একমাত্র জানালাটার কাঠের কবাটগুলো খুলে দিলেন। মানুষ, গোবর, পোড়া ঘি এবং ধোঁয়ার বিশ্রী দুর্গন্ধ আর প্রচণ্ড গরমে রীতিমত নরকে পরিণত হওয়া কুঁড়েটার মধ্যে জঙ্গলের দিক থেকে মিষ্টি পরিষ্কার একটা দমকা হাওয়া বইতে শুরু করল। কানওয়ার সিং-এর দুর্বল শরীরটা করবেট যখন তুলেছেন তার মধ্যে তখন জীবনের সামান্যই অবশিষ্ট ছিল। কোটরে ঢুকে পড়া চোখ দুটো বন্ধ, ঠোঁটগুলো হয়ে গিয়েছিল নীল, আর সে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল একটু পর পর বিরতি দিয়ে। কিন্তু এখন জঙ্গলের ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শে আস্তে আস্তে তার অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করেছে। তার শ্বাস-প্রশ্বাস অনেকটা নিয়মিত হয়ে এসেছে। এবং শ্বাস নিতে এখন কম পরিশ্রম করতে হচ্ছে। তার বিছানায় বসে দরজা দিয়ে বাইরে তাকাতেই করবেট দেখলেন একটু আগে শোক করতে থাকা যে লোকগুলোকে তিনি কুঁড়ে থেকে বের করে দিয়েছেন তাদের মধ্যে আবার মৃদু গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে। তারপরেই আবিষ্কার করলেন কানওয়ার সিং চোখ খুলে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। মাথাটা না ঘুরিয়েই করবেট বলতে শুরু করলেন, সময় বদলে গেছে, আজেল, সেই সাথে তুমিও। এমন একটা সময় ছিল যখন কেউ

www.BanglaBook.org

তোমাকে নিজের ঘর থেকে সরাতে এবং সমাজচ্যুত ভিখারীর মত চাকরের ঘরের মেঝেতে মরার অপেক্ষা করার জন্য ফেলে রাখতে সাহস করত না। তুমি আমার উপদেশ শোনোনি। এখন সর্বনাশা আফিম তোমাকে সেই পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। তুমি জানো, তোমার ডাক পেয়ে আমি যদি এখানে আসতে কয়েক মিনিট দেরি করতাম তবে এতক্ষণে তুমি মৃত্যুর রাস্তায় হাঁটতে। চাঁদনি চকের মোড়ল আর কালাধুঙ্গির সেরা শিকারী হিসাবে সবাই তোমাকে শ্রদ্ধা করত। কিন্তু এখন তুমি সেই শ্রদ্ধা হারিয়েছ: তুমি ছিলে শক্তিশালী, আর বেশি খেতে অভ্যস্ত, এখন হয়ে পড়েছ দুর্বল। এখানে আসার সময় তোমার ছেলে আমাকে জানিয়েছে তোমার মুখে গত ষোলো দিন কিছুই ঢোকানো যায়নি। কিন্তু বৃদ্ধ বন্ধু, তুমি মারা যাচ্ছ না। তুমি আরও অনেক বছর বাঁচবে, এবং যদিও আমরা সম্ভবত আর কখনও এক সাথে গারুপুর জঙ্গলে শিকার করব না, তবুও তোমার কখনও শিকারের অভাব হবে না, কারণ আমি আমার সমস্ত শিকারই তোমার সাথে ভাগ করে নেব, যা আমি সব সময় করে এসেছি।

'আর এখন এই কুঁড়েতে পবিত্র সুতো আঙুলে পেঁচিয়ে, পিপুল গাছের পাতা হাতে নিয়ে তোমার বড় ছেলের মাথায় একটা হাত রেখে শপথ করো, আর কখনও তুমি এই বাজে জিনিস স্পর্শ করবে না। এবং তোমার ছেলের আনা দুধের অপেক্ষায় থাকার সময় আমরা ধূমপান করব।'

করবেট যখন কথাগুলো বলছিলেন কানওয়ার সিং একবারের জন্যও তাঁর দিক থেকে চোখ সরায়নি এবং এখন প্রথমবারের মত তার ঠোঁট দুটো ফাঁক করে সে বলল, 'মরতে বসা একজন মানুষ কী করে ধূমপান করবে?'

'মৃত্যু সম্পর্কে আমরা আর কোনও আলোচনা করব না। আমি তোমাকে এইমাত্র যা বলেছি, তুমি মারা যাচ্ছ না। আর আমরা কেমন করে ধূমপান করব তা এখন আমি তোমাকে দেখাচ্ছি।'

নিজের কেস থেকে দুটো সিগারেট বের করে একটা জ্বালিয়ে কানওয়ারের দুই ঠোঁটের মাঝে ঢুকিয়ে দিলেন তিনি। খুব আস্তে আস্তে একটা টান দিল সে। কাশতে শুরু করল এবং দুর্বল হাত দিয়ে সিগারেটটা টেনে ঠোঁটের ফাঁক থেকে বের করে আনল। তবে কাশি থামতেই আবার ঠোঁটের ফাঁকে ঢোকাল, তারপর টানতে শুরু করল। তাঁদের ধূমপান শেষ হবার আগেই বিশাল এক পিতলের গামলা ভর্তি দুধ নিয়ে কানওয়ার সিং-এর ছেলে হাজির হলো সেখানে। করবেট যদি তাড়াতাড়ি তার হাত থেকে গামলাটা নিয়ে না নিতেন তবে বিস্ময়ে হতবাক ছেলেটা সম্ভবত ওটাকে দরজার উপর ফেলে দিত। তার বিস্ময়ের কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। তার বাবা, যাকে সে শেষ বার মেঝেতে শুয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণতে দেখে গেছে, সে এখন বিছানায় শুয়ে করবেটের টুপিতে মাথা এলিয়ে দিয়ে দিব্যি সিগারেট ফুঁকছে:

www.BanglaBook.org

করবেট বেশ রাত পর্যন্ত কুঁড়েতে থাকলেন। এবং তিনি যখন ফিরে আসছেন, প্রচুর পরিমাণ দুধ পান করে গরম আর আরামদায়ক একটা বিছানায় শুয়ে কানওয়ার সিং তখন শান্তিতে ঘুমাচ্ছে। তবে কুঁড়ে ছাড়ার আগে তার ছেলেকে সতর্ক করে দিলেন, সে যেন কাউকে ঘরের কাছে আসতে না দেয়, আর নিজে তার পাশে বসে থাকে এবং যতবারই ঘুম থেকে জেগে উঠবে তাকে একটু করে দুধ পান করায়। সকালে এখানে ফিরে যদি কানওয়ার সিংকে মৃত অবস্থায় খুঁজে পান তবে তিনি পুরো গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে দেবেন।

পরদিন সূর্য যখন কেবল আলো ছড়াতে শুরু করেছে তখন করবেট চাঁদনী চকে ফিরে এসে দেখলেন কানওয়ার সিং আর তার ছেলে দুজনেই গভীর ঘুমে ডুবে আছে। এবং পিতলের গামলাটাতে দুধের চিহ্নমাত্র নেই।

কানওয়ার সিং তার কথা রেখেছে, সে আর কোন দিন আফিম খায়নি। যদিও করবেটকে শিকার অভিযানে সঙ্গ দেয়ার মত শক্তি সে আর কখনও ফিরে পায়নি। সে প্রায়ই তার সাথে দেখা করতে আসত। এই ঘটনার চার বছর পর নিজের ঘরে নিজের বিছানায় শুয়ে স্বাভাবিক ভাবে তার মৃত্যু হয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

## জঙ্গলের আইন

হারকুয়ার আর কুন্তির যখন বিয়ে হলো তখন তাদের বয়সের যোগফল দুই অঙ্কের কোঠাও ছুঁতে পারেনি। তখনকার দিনে ভারতে এটা ছিল খুব সাধারণ ঘটনা। মহাত্মা গান্ধী আর মিস মায়ো যদি পৃথিবীতে না আসতেন, তবে এখনও হয়তো সে অবস্থাই থাকত।

বিশাল নুনাগিরি পর্বতের পাদদেশের কয়েক মাইলের মধ্যে দুটো গ্রামে বাস করে হারকুয়ার আর কুন্তি। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের উপস্থিতিতে উজ্জ্বল, নতুন পোষাক পরিয়ে এই বালক-বালিকার বিয়ে পড়িয়ে দেয়া হলো। বিয়ের আগে একজন আরেকজনকে দেখেওনি।

বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে আবার বাবার বাড়িতে ফিরে আসল কুন্তি। গরীব পরিবারের সন্তানদের সাধারণত যেসব দায়িত্ব পালন করতে হয়, কয়েকটা বছর নিষ্ঠার সাথে তাই করে গেল সে। তবে বিয়ের পর একটা পরিবর্তন এসেছে তার জীবনে। এখন আর অবিবাহিত মেয়েদের মত একপ্রস্থ কাপড়ের পোষাক পরতে পারে না কুন্তি! তার তিনপ্রস্থ কাপড়ের পোষাকটার মূল অংশ, দেড় গজ লম্বা একটা চাদর। গায়ে জড়ানো চাদরটার এক প্রান্ত তার মাথা ঢেকে রাখে, আর অন্য প্রান্ত গোঁজা থাকে ছোট্ট স্কার্টটার মধ্যে। চাদর আর স্কার্টটা ছাড়া তৃতীয় যে কাপড়টা পরে, ওটা হাতাহীন একটা ছোট্ট কাঁচুলি।

বাবার বাড়িতে বেশ কয়েকটা বছর নির্ঝঞ্ঝাটে কাটিয়ে দিল কুন্তি। ইতিমধ্যে দাম্পত্যজীবন কন্টানের মত বড় হয়ে উঠেছে সে। তারপর একদিন তাদের সমাজের নিয়ম অনুযায়ী বালক স্বামীর বাড়িতে তুলে নেয়া হলো তাকে। বাবার বাড়ির সঙ্গে স্বামীর বাড়ির শুধু একটাই পার্থক্য চোখে পড়ল মেয়েটার। বাবার বাড়িতে মাকে কাজে সাহায্য করতে হত, আর এখানে শাশুড়িকে। ভারতের গরীব পরিবারগুলোয় বসে বসে খাওয়ার কোন সুযোগ নেই। বুড়ো, কম বয়সী সবাইকে এখানে তাদের নির্ধারিত কাজ করতে হয়। আর তা আনন্দের সাথেই করে ওরা।

হারকুয়ারের বাবা একজন রাজমিস্ত্রি। আমেরিকান মিশন স্কুলে যে গির্জাটা তৈরি হচ্ছে, এখন সেখানেই কাজ করছে সে। বড় হয়ে হারকুয়ারও এই পেশাই বেছে নিতে চায়, তবে রাজমিস্ত্রির কাজ করার মত কর্মক্ষমতা এখনও না হওয়ায় গির্জা তৈরির বিভিন্ন সামগ্রী বহন করে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেয় সে। দিনে দশ ঘন্টা পরিশ্রম করে সে পায় দুই আনা। আর এভাবেই রোজগার করে পরিবারের ভার কিছুটা লাঘব করার চেষ্টা করে হারকুয়া।

www.BanglaBook.org

গ্রামের পাশের নিচু জমির শস্যগুলো আস্তে আস্তে পাকতে শুরু করে। সকালে খাবার-দাবারের পর বাসন-কোসনগুলো ধোয়া-মোছা করেই শাশুড়ি আর ননদদের সঙ্গে গ্রামের মোড়লের জমিতে কাজ করতে চলে আসে কুন্তি। তার স্বামী যত ঘণ্টা কাজ করে গ্রামের অন্য সব মহিলা আর মেয়েদের সাথে তত ঘণ্টা কাজ করলেও তার আয় স্বামীর রোজগারের অর্ধেক। কাজ শেষ হলে গোধূলির ম্লান আলোয় পরিবারের আর সবার সঙ্গে আস্তে আস্তে কুঁড়ের দিকে রওয়ানা হয়। মোড়লের জমিতে তার অনুমতি নিয়ে কুঁড়েটা তৈরি করেছে হারকুয়ারের বাবা। রাতে খাওয়া-দাওয়া আর ধোয়া-মোছা শেষে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে সবাই ঘুমাতে যায় তাদের নির্ধারিত জায়গায়, হারকুয়ার আর তার ভাইয়েরা ঘুমায় তাদের বাবার সঙ্গে। অপরদিকে কুন্তিকে ঘুমাতে হয় পরিবারের অন্য সব মেয়েদের সঙ্গে।

হারকুয়ার বয়স যখন আঠারো, আর কুন্তির ষোলো, নিজেদের সামান্য সম্বল নিয়ে বাড়ি ছাড়ল দু'জন। নতুন সংসার শুরু করল রানিক্ষেত ক্যান্টনমেন্ট থেকে মাইল তিনেক দূরের এক কুঁড়েতে। তার এক চাচার কাছ থেকে কুঁড়েটার সম্পূর্ণ অধিকার বুঝে নিয়েছে হারকুয়ার। সেনানিবাসে তখন কয়েকটা ব্যারাক তৈরির কাজ চলছে। ফলে রাজমিস্ত্রির কাজ জুটিয়ে নিতে কোন সমস্যাই হলো না হারকুয়ারের। শ্রমিকের কাজ খুঁজে পেতে কুন্তিরও কোন অসুবিধা হলো না।

পরের চারটে বছর রানিক্ষেতের ব্যারাকেই কাজ করল এই দম্পতি। ইতিমধ্যে তাদের ঘর আলো করে এসেছে দুটি সন্তান। কিন্তু চতুর্থ বছরের নভেম্বরে ব্যারাক তৈরির কাজ শেষ হয়ে গেলে বিপাকে পড়ল ওরা। তাদের অবশ্যই নতুন কাজের খোঁজ করতে হবে। ওদের এমন সঞ্চয় নেই যে, দিনের পর দিন বসে বসে খেতে পারবে।

সে বছর শীত পড়ল তাড়াতাড়ি। এবারকার শীত যে নির্দয়ভাবে কামড় দেবে সে ইঙ্গিতও পাওয়া গেল গোড়াতেই। এদিকে পরনের তেমন কোন গরম কাপড় নেই ওদের। এক সপ্তা কাজের খোঁজে ব্যর্থ চেষ্টার পর হারকুয়ার পর্বতের ঢালের দিকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। সেখানে খাল কাটার কাজ শুরু হবে বলে শুনেছে সে। অতএব ডিসেম্বরের প্রথম ভাগেই পাহাড়ের ঢালের দিকে রওয়ানা হলো পরিবারটি। গত চার বছর যে গ্রামটিতে কাটিয়েছে ওরা সে জায়গা আর যেখানে খাল কাটার কথা শুনেছে হারকুয়ার, সেই কালাধুঙ্গির মাঝের দূরত্ব অন্তত পঞ্চান্ন মাইল। এই বিশাল দূরত্ব পাড়ি দেওয়ার পথে ওদের পুঁজি কেবল প্রচণ্ড মানসিক শক্তি। রাতে গাছের নীচে ঘুমিয়ে, দিনে বাচ্চা দুটো আর সমস্ত মাল-পত্র পালাক্রমে বহন করেছে ওরা। এভাবে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে কালাধুঙ্গি পৌঁছতে তাদের ছয় দিন লেগে গেল।

এদিকে পাহাড়ের উঁচু এলাকা থেকে আসা ভূমিহীন মানুষ তাদের আগেই এখানে পৌঁছে গেছে। ইতিমধ্যে ত্রিশটা পরিবার থাকার উপযোগী বড় বড়

www.BanglaBook.org

কয়েকটা কুঁড়ে তৈরি করে ফেলেছে তারা। কিন্তু এসব কুঁড়ের কোনটাতেই জায়গা হলো না হারকুয়ার আর কুন্তির। তাই নিজেদেরই ব্যবস্থা করে নিতে হলো ওদের। জঙ্গলের কিনার ঘেঁষে, কিন্তু বাজার থেকে বেশি দূরে নয়, এমন একটা জায়গা বেছে নিল তারা। সেখান থেকে জ্বালানীও পাওয়া যায় সহজে। তারপর রাত-দিন খেটে গাছের পাতা আর ডাল-পালা দিয়ে ছোট একটা কুঁড়ে তৈরি করে ফেলল নিজেদের জন্য।

যে জঙ্গলটার কিনার ঘেঁষে হারকুয়ার আর কুন্তি তাদের ঘর তৈরি করেছে, সেটা করবেটের খুব প্রিয় একটা শিকারের জায়গা। প্রথম প্রথম তিনি ওখানে শটগান হাতে ঢুকতেন বন মোরগ আর ময়ূর শিকারের জন্য। পরে অবশ্য বড় শিকারের খোঁজে রাইফেল হাতে পুরো জঙ্গলটাই চষে বেড়িয়েছেন। তাদের তিন বছর বয়সী ছেলে পুনা আর দুই বছরের মেয়ে পুভালিকে নিয়ে পরিবারটি যখন কুঁড়েতে আস্তানা গাড়ল; তখন করবেট নিশ্চিতভাবেই জানতেন জঙ্গলে পাঁচটা বাঘ, আটটা চিতাবাঘ, বিভিন্ন প্রজাতির সাপ, ভল্লুক আর অন্তত শ'খানেক শকুন নিরাপদে বিচরণ করত। সাধারণত মানুষের ক্ষতি করে না এমন প্রাণী যেমন—হরিণ, অ্যান্টিলোপ, শুয়োর, আর বানরদের কথা এখানে উল্লেখ করা হলো না কারণ, আজকের এই গল্পে এদের কোন স্থান নেই।

জীর্ণ কুঁড়ে ঘরটা যেদিন তৈরি হলো তার পরদিনই খাল তৈরির কন্ট্রাক্ট পেল ঠিকাদার। আর তার অধীনে রাজমিস্ত্রির কাজ পেল হারকুয়ার। পারিশ্রমিক পাবে রোজ আট আনা। এদিকে দুই রানীর বিনিময়ে বনবিভাগ থেকে পাহাড়ের ঢালে ঘাস কাটার অনুমতি যোগাড় করল কুন্তি। বাজারের দোকানগুলোয় গবাদিপশুর খাবার হিসাবে এই ঘাস বিক্রি করবে সে। প্রতিদিন আশি পাউন্ডের বেশি ওজনের এই ঘাসের বোঝা নিয়ে দশ থেকে চোদ্দ মাইল উঁচু-নিচু পাহাড়ি পথ বেয়ে এনে বিক্রি করে সে চার আনায়। এর মধ্যে এক আনা দিতে হয় তাকে, বাজারে ঘাস বিক্রি করার সরকারি অনুমতি পেয়েছে যে লোক। হারকুয়ারের আয় আট আনা আর কুন্তির তিন আনা। এই রোজগারে পরিবারটির দিন মোটামুটি ভালই কাটতে লাগল। কারণ খাবারের কোন অভাব ছিল না তখন। আর দামও ছিল সস্তা। জীবনে প্রথমবারের মত এখন মাসে এক বেলা করে মাংস খেতে পারে তারা।

তিন মাস কালাধুঙ্গিতে থাকবার পরিকল্পনা করেছে হারকুয়ার আর কুন্তি। প্রথম দু'মাস বেশ শান্তিতেই কাটল। কাজ করতে হত বেশ লম্বা সময় ধরে। আর বিশ্রামেরও কোন উপায় নেই। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই এতে অভ্যস্ত ওরা দু'জন। এখানকার আবহাওয়াও চমৎকার, ছেলে-মেয়ে দুটোর স্বাস্থ্যও ভাল। ঘর তৈরির সময় কিছুদিন ওদের আধপেটা খেয়ে থাকতে হয়েছিল।

ছেলে-মেয়ে দুটো শুরুতে কিছুটা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল। কারণ তারা এত ছোট যে বাবার সঙ্গে খালের কাজে কিংবা মার সঙ্গে লম্বা পথ পাড়ি

www.BanglaBook.org

দেয়া—কোনটাই সম্ভব ছিল না তাদের পক্ষে।

এসময়ই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল : কয়েকশ' গজ দূরের বড় কুঁড়েতে বাস করা এক দয়ালু খোঁড়া মহিলা। বাবা-মা কাজে থাকার সময়টা বাচ্চাদুটোর দায়িত্ব নিল সে।

চারটে শুখা ভাল্লুকের একটা পাল বাস করছে পাহাড়ে। উঁচু এলাকা থেকে প্রায়ই কিসমিস আর মধু খাবার জন্য নীচে নেমে আসে বিশালাকৃতির দুটো হিমালয়ান কালো ভাল্লুক। পাঁচ মাইল দূরের ঘেসো জমিতে গর্ত বানিয়ে বাস করা হায়েনার দল জঙ্গলে আসে বাঘ আর চিতার উচ্ছিষ্ট দিয়ে পেট ভরার আশায়। দুই জোড়া বুনো কুকুর, অসংখ্য শিয়াল, খেঁক শিয়াল, পাম সিভেট আর বনবিড়ালদেরও আড্ডা জঙ্গলে। দুটি অজগরসহ আর জায়গাটা দুই মাস বেশ নিশ্চিন্তেই রাখল তাদের। প্রতিদিন সন্ধ্যায় চার মাইল দূর থেকে খাল কাটার কাজ সেরে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যেত হারকুয়ারের। আরও পরে বাজারে ঘাস বিক্রি করে ফিরে আসত কুন্তি। স্বামী-স্ত্রী এসে দেখত পুনা আর পুতালি প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় থাকত।

শুক্রবার বাজার বসে কলাধুঙ্গিতে। আশপাশের গ্রামের মানুষ এদিন একবার হলেও ঘুরে যায় এখান থেকে। বাজারের অস্থায়ী চালা ঘরগুলোতে সস্তা খাবার, ফল আর শাক-সব্জির পসরা সাজিয়ে বসে বিক্রেতারা। আর এই বাজারের দিনগুলোতে আধ ঘণ্টা আগেই কাজ থেকে ফিরে আসে হারকুয়ার আর কুন্তি। কারণ কিছু শাক-সব্জি যদি তখনও রয়ে যায়, তবে দোকান বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে বেশ সস্তাতেই ওগুলো কিনে নিতে পারে ওরা।

এমনই এক শুক্রবারের ঘটনা—কিছু শাক-সব্জি আর এক পাউণ্ড ছাগলের মাংস নিয়ে বাজার থেকে ফিরে এসে বাচ্চা দুটোকে কুঁড়েতে দেখতে পেল না হারকুয়ার আর কুন্তি। সেই খোঁড়া মহিলাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল দুপুরের পর আর ওদের দেখেনি সে : তবে তার ধারণা পুনা আর পুতালি বাজারের দিকে গেছে। ওখানে একটা খোড়ার নাগরদোলা বসানো হয়েছে। তাদের কুঁড়ের ছেলে-মেয়েগুলো ওটা দেখতে ছুটেছে। কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে বাচ্চা দুটোর খোঁজে বাজারের দিকে রওয়ানা হলো হারকুয়ার। আর কুন্তি বাড়ি ফিরে আসল রাতের খাবার তৈরি করতে। একঘণ্টা পর কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসল হারকুয়ার, এরাও তার সঙ্গে পুনা আর পুতালিকে খুঁজেছে। কিন্তু কেউই তাদের কোন খোঁজ পায়নি। এমনকী ছেলে-মেয়ে দুটোকে দেখেছে এমন খবরও দিতে পারেনি কেউ।

এদিকে এসময় সারা ভারত জুড়েই বাচ্চা চুরি করে নিয়ে যাওয়ার গুজব বেশ ভালভাবেই ছড়িয়েছে। ভিক্ষুকরাই নাকি এ কাজ করে। তারা নাকি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেয় ছেলে-মেয়েগুলোকে। এ কথা কতটা

www.BanglaBook.org

সত্যি তা জানা নেই রুবেটের। তবে দৈনিক পত্রিকাগুলোয় প্রায়ই ফকিররা সাধারণ মানুষদের আক্রমণের শিকার হয়েছে এমন খবর দেখেছেন তিনি। বেশ কয়েক জায়গায় পুলিশ না এলে উত্তেজিত লোকেরা তাদের ঝুলিয়েই দিত। অতএব এটা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে ভারতের প্রায় সব বাবা-মাই কম-বেশি এই ফকিরদের গল্প শুনেছে। এদিকে পুনা আর পুতালিকে তন্নতন্ন করে খুঁজেও না পেয়ে ফিরে আসা হারকুয়ার আর তার সাহায্যকারীরা কুন্তিকে জানাল বাচ্চা দুটোকে হয়তো ফকিরেরই ধরে নিয়ে গেছে। সম্ভবত বাচ্চা চুরি করার জন্য আগে থেকেই বাজারের ভিড়ের মধ্যে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছিল ফকির লোকটা।

গ্রামের একেবারে নীচের দিকে ছোট্ট একটা পুলিশ ফাঁড়ি আছে। চার্জে থাকা হেড কনস্টেবল ছাড়া আরও দু'জন কনস্টেবল আছে ফাঁড়িটায়। বেশ কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী সহ এই পুলিশ ফাঁড়িতে এসে হাজির হলো হারকুয়ার আর কুন্তি। হেড কনস্টেবল একজন বয়স্ক, দয়ালু মানুষ। তাঁর নিজেরও ছেলে-মেয়ে আছে। যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে হতাশায় ভেঙে পড়া বাবা-মার কাছ থেকে ঘটনাটা শুনলেন তিনি। এবং ডায়রি লিখে নিলেন। তারপর জানালেন, আজ রাতে তো আর কিছু করা যাবে না, তবে কাল সকালেই কালাধুঙ্গির পনেরোটা গ্রামে এই নিখোঁজ সংবাদ প্রচার করে দেয়ার জন্য সরকারী ঘোষককে পাঠাবেন তিনি। উনি পরামর্শ দিলেন, যদি ঘোষক বাচ্চাদের খুঁজে পাওয়ার বিনিময়ে পঞ্চাশ রূপী পুরস্কারের ঘোষণা দিতে পারে, তবে নিঃসন্দেহে মানুষ আগ্রহী হবে। কিন্তু মাত্র পঞ্চাশ রূপী! পৃথিবীতে মানুষের কত দাম থাকতে পারে সে ব্যাপারে কোন ধারণা নেই হারকুয়ার আর কুন্তির। তবে পর দিন সকালে গ্রামগুলোতে বাচ্চা হারানো সংবাদ প্রচারের পুরস্কারের ঘোষণা করল অবশ্যই। হেড কনস্টেবলের পরামর্শ অনুযায়ী কালাধুঙ্গির একলোক পুরস্কারের টাকাটা দিতে রাজি হয়।

সেদিন সন্ধ্যায় খাওয়ার আয়োজন করতে অনেক দেরি হলো। বাচ্চাদের খাবার আলাদা করে রেখে দেয়া হলো, প্রচণ্ড শীত পড়ায় সারা রাতই ছোট একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলল। কোন উত্তর পাওয়া যাবে না জেনেও একটু পরপরই বাইরে বের হয়ে বাচ্চাদের নাম ধরে ডাকতে লাগল উদ্বিগ্ন বাবা-মা।

কালাধুঙ্গিতে দুটি রাস্তা এসে মিলেছে, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে চলে যাওয়া রাস্তাটা গেছে হলদুয়ানি থেকে রামনগর পর্যন্ত। নৈনিতাল থেকে বাজপুরের দিকে গেছে অন্য রাস্তাটা। শুক্রবার রাতে ছোট্ট অগ্নিকুণ্ডটার কাছে বসে বসে হারকুয়ার আর কুন্তি একটা সিদ্ধান্ত নিল। পরদিন সকালের মধ্যেও যদি ছেলে-মেয়ে দুটো ফিরে না আসে তবে তাদের খোঁজে প্রথম উল্লেখিত রাস্তাটা ধরে বের হয়ে যাবে ওরা। অপহরণকারীদের এ পথটাই বেছে নেবার সম্ভাবনা বেশি। শনিবার ভোরে আলো ফুটতেই, হেড কনস্টেবলকে তাদের সিদ্ধান্তের কথা জানানোর জন্য পুলিশ ফাঁড়িতে হাজির হলো দু'জনে। তাদের পরিকল্পনা শুনে পুরো বিষয়টা হলদুয়ানি

www.BanglaBook.org

আর রামনগরের পুলিশ ফাঁড়িতে জানানোর পরামর্শ দিল হেড কনস্টেবল। তাদের মনকে কৃতজ্ঞতায় ভরিয়ে দিয়ে হেড কনস্টেবল জানাল—ইতিমধ্যে একটা চিঠি দিয়ে একজন ডাকপিয়নকে হলদুয়ানির পুলিশ ইন্সপেক্টরের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি। চিঠিতে বাচ্চা দুটোর খোঁজে প্রতিটি রেলজংশনে টেলিগ্রাম করার অনুরোধও করেছেন। চিঠির সাথে পুনা আর পুতালির চেহারার বর্ণনাও লিখে দিয়েছেন তিনি।

সেদিন সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের একটু আগে আটাশ মাইলের দীর্ঘযাত্রা শেষে হলদুয়ানি থেকে ফিরে এসেল কুম্ভি। প্রথমেই সরাসরি পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে সন্তানদের খোঁজ নিল সে। তারপর হেড কনস্টেবলকে জানাল, সেখানকার পুলিশ ফাঁড়িতে বিষয়টা রিপোর্ট করে এসেছে সে। কিছুক্ষণ পরেই ছত্রিশ মাইল পায়ে হেঁটে রামনগর থেকে ফিরে আসল হারকুয়ার। সেও সরাসরি পুলিশ ফাঁড়িতে হাজির হলো। কোন খবর পেতে সে-ও ব্যর্থ হয়েছে। তবে রামনগর পুলিশের কাছে হেড কনস্টেবলের বার্তা পৌঁছে দিতে ভুল করেনি সে। রাতে বাড়ি ফিরে দেখল, বেশ কয়েকজন প্রতিবেশী আর বন্ধু-বান্ধবের সামনে অপেক্ষা করছে তাদের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য। এদের মধ্যে সন্তানদের অমঙ্গলের আশঙ্কায় চিন্তিত অনেক মা-ও আছেন।

শনিবারের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটল রবিবারে। পার্থক্য শুধু এটুকু—পূর্ব আর পশ্চিমে যাওয়ার বদলে কুম্ভি গেছে উত্তরে নৈনিতালের দিকে আর হারকুয়ার গেছে দক্ষিণে বাজপুরের দিকে। আসা-যাওয়া মিলিয়ে ত্রিশ মাইল পাড়ি দিতে হয়েছে কুম্ভিকে আর হারকুয়ারকে বত্রিশ মাইল। এসময় ওদের এমনও বিপজ্জনক পথ পার হতে হয়েছে, বড় দল ছাড়া যে রাস্তায় যেতে সাহস করে না সাধারণ মানুষ। স্বাভাবিক অবস্থায় এ রাস্তা দিয়ে তারা দু'জনও একা যাওয়ার কথা কল্পনা করত না। কিন্তু এখন সন্তানের দুশ্চিন্তায় ডাকাত কিংবা বন্যপ্রাণীর ভয় জাগত না একবারের জন্যও।

রবিবার সন্ধ্যায়ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসল ওরা। এখানেও অপেক্ষা করছে দুঃসংবাদ। আশপাশের প্রতিটি গ্রামে নিখোঁজ সংবাদ প্রচার করে সরকারি ঘোষকও ফিরে এসেছে ব্যর্থ হয়ে। আর পুলিশের অভিধানেও এমন কোন সূত্র পাওয়া যায়নি যাতে বাচ্চা দুটোকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এবার একেবারে হতাশায় ভেঙে পড়ল হারকুয়ার আর কুম্ভি। পুনা আর পুতালিকে আবার দেখার আশা পুরোপুরি ছেড়ে দিল তারা। দেবতারা কেন তাদের উপর রুষ্ট হয়েছেন, কেনই বা দিনের আলোয় তাদের ফুটফুটে দুটোকে চুরি করে নিয়ে যেতে দিয়েছেন ফকিরকে সে রহস্যের সমাধান করতে পারল না তারা। এমনকী কালাধুঙ্গির সেই মন্দিরটার সামনে দিয়ে যাবার সময় বাইরে থেকে হাত উঁচু করে প্রণাম জানিয়েছে ওরা। তাদের মত নিচু জাতের লোকদের প্রবেশ নিষেধ

www.BanglaBook.org

সেখানে।

ঘরে এককণা খাবারও নেই। কাজ না করলে খাবার জুটবে কোত্থেকে। কিন্তু যাদের জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রাণান্তকর পরিশ্রম করেছে তারা, সেই সন্তানেরাই যেহেতু নেই, কী হবে এত সব করে! ভাবল ওরা। সান্ত্বনা দিতে আসা বন্ধুদের দিকেও কোন খেয়াল নেই তাদের। কুঁড়ের একটা দরজায় বসে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথাই যেন চিন্তা করছে হারকুয়ার। এদিকে কুন্তি, কাঁদতে কাঁদতে তার চোখের জল নিঃশেষ করে ফেলেছে। এতটুকু পানিও আর অবশিষ্ট নেই তার চোখে। ঘরের এক কোণে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেবল দুলছে।

এ সোমবারেই, যে জঙ্গলটায় বিভিন্ন বন্য জীব-জন্তু বাস করার কথা বলেছেন করবেট, সেখানে মোষ চরাতে নিয়ে গেল তারই পরিচিত এক লোক। গরীব এই লোকটা জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছে জঙ্গলে। গ্যাভাবপুর গ্রামের মোড়লের মোষ চরিয়ে। কাজেই এই জঙ্গলে যে বাঘের ভয় আছে তা ভালই জানা আছে তার। সন্ধ্যা ঘনাতেই জন্তুগুলোকে জড়ো করে ঘন বনের মাঝ দিয়ে চলে যাওয়া একটা রাস্তা ধরে গ্রামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল সে।

একটু পরই একটা অদ্ভুত ব্যাপার নজরে পড়ল তার। একটা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছতেই মোষগুলো ডান দিকে মাথা ঘুরিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। পিছনের পশুটার শিং-এর গুঁতো খাওয়ার আগ পর্যন্ত আর জায়গা ছেড়ে নড়ছে না। লোকটা নিজে যখন সেই জায়গায় পৌঁছল, তখন সে-ও ডান দিকে মাথা ঘুরিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। রাস্তা থেকে কয়েক ফুট দূরে কিছুটা নিচু একটা জায়গায় দুটো বাচ্চা শুয়ে আছে।

ঘোষক যখন শনিবার সারাগ্রামে নিখোঁজ সংবাদ প্রচার করে বেড়াচ্ছে তখন পশুর পালের সাথে জঙ্গলে ছিল সে। তবে সেরাতে আর পরদিন রাতে পুরো কালাধুঙ্গির গল্পের আসরে আলাপের প্রধান বিষয় ছিল হারকুয়ারের বাচ্চাদের হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা। এরাই যে সেই হারিয়ে যাওয়া বাচ্চা, যাদের জন্য পঞ্চাশ রূপী পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে সে-ব্যাপারে কোন সন্দেহ রইল না তার মনে। কিন্তু মনে হচ্ছে ওরা নিষ্প্রাণ। বাচ্চা দুটোর শরীরে কোন কাপড়-চোপড় নেই। একে অপরের হাত জড়িয়ে ধরে আছে। নিচু জায়গায় নেমে এসে মৃতদেহ দুটোর পাশে উবু হয়ে বসে বোঝার চেষ্টা করল কীভাবে ওরা মারা গেছে। কাছ থেকে তীক্ষ্ণভাবে পরীক্ষা করতে গিয়েই ব্যাপারটা চোখে পড়ল তার। বাচ্চাদুটো নিঃশ্বাস নিচ্ছে। ওরা তা হলে মরেনি, ঘুমিয়ে আছে! লোকটার নিজেরও ছেলে-মেয়ে আছে। খুব সাবধানে বাচ্চা দুটোকে স্পর্শ করে, আস্তে আস্তে ঘুম ভাঙাল তাদের। সে একজন ব্রাহ্মণ। আর এরা, নিম্নবর্ণের দুটো শিশু। এদের স্পর্শ করে তার গোত্রের বিচারে নিঃসন্দেহে জাত খোয়াল সে। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে, জাত-

www.BanglaBook.org

পাতের কী আসে যায়? অতএব মোষগুলোকে বাড়ির দিকে ফিরতে দিয়ে বাচ্চাদুটোকে কোলে তুলে নিল সে। রাখাল লোকটা খুব শক্তিশালী নয়। এসব পাহাড়ি এলাকায় বাস করা অন্য সবার মত প্রায়ই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হতে হয় তাকে। জঙ্গলের বুনো প্রাণী আর গবাদিপশু চলাচলের পথগুলো চলে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে, কিন্তু তাকে যেতে হচ্ছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে। ফলে দুর্ভেদ্য জঙ্গল আর গভীর গিরিখাদগুলোকে এড়ানোর জন্য অনেকটা ঘুরপথে চলতে হচ্ছে। কিন্তু একজন শক্ত-সমর্থ পুরুষ মানুষের মতই বাচ্চাদুটোকে দুই কাঁধে নিয়ে এগিয়ে চলল সে। একটু পরপরই জিরিয়ে নিচ্ছে সে, দীর্ঘ ছয় মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে তাকে। পুতালি কথা বলার মত অবস্থায় নেই। তবে পুনা কিছু কথা বলতে পারল। যাতে বোঝা গেল জঙ্গলে খেলতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে তারা।

কুঁড়ের দরজায় বসে একদৃষ্টিতে রাতের অন্ধকার দিকে তাকিয়ে আছে হারকুয়ার। আস্তে আস্তে বিভিন্ন দিকে লণ্ঠন আর মশালের জন্য ধরানো চুলো জ্বলে উঠতে শুরু করেছে। ঠিক এসময়ই বাজারের দিক থেকে একদল লোককে এগিয়ে আসতে দেখল সে। দলটার সামনে যে লোকটা আছে তার দু'কাঁধে কোন বোঝা আছে। চারপাশ থেকে আরও লোক এসে দলটার সঙ্গে যোগ দিচ্ছে, তারপরই উত্তেজিত একটা কণ্ঠ ভেসে আসল— 'হারকুয়ারের ছেলে মেয়ে'। নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারল না সে। কিন্তু লোকগুলো নিঃসন্দেহে তাদের কুঁড়ের দিকেই এগিয়ে আসছে।

প্রচণ্ড দুঃখ, যন্ত্রণা আর শারীরিক দুর্বলতার কারণে সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে যাওয়া কুন্তি, সবার অলক্ষে ঘুমে তলিয়ে গেছে। কুঁড়ের এককোণে বেঁকে-চুরে পড়ে আছে তার দেহটা।

ধাক্কা দিয়ে তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দরজার কাছে নিয়ে আসল হারকুয়ার। ঠিক ওই সময়ে পুনা আর পুতালিকে নিয়ে রাখাল লোকটাও দরজার কাছে পৌঁছে গেছে।

চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বাচ্চাদের কোলে তুলে নিল বাবা-মা। তারপর উদ্ধারকারীকে ধন্যবাদ, আশীর্বাদ আর বন্ধুদের অভিনন্দনের পর্ব চলল। এসব কিছু যখন স্তিমিত হয়ে আসল, রাখাল লোকটার প্রাপ্য পঞ্চাশ রূপী পুরস্কারের টাকাটা নিয়ে বাদানুবাদ শুরু হলো উপস্থিত লোকদের মধ্যে। একজন গরীব লোকের কাছে সে সময় পঞ্চাশ রূপী, একটা বিশাল অঙ্ক। এই টাকা দিয়ে অনায়াসে তিনটে মোষ কিংবা গোটা দশেক গরু কেনা যায়। কিন্তু লোকেরা যা ভেবেছে, তার চেয়েও অনেক মহৎ হৃদয়ের লোক এই উদ্ধারকারী। পুরস্কারের একটা রূপীও স্পর্শ করতে রাজী হলো না সে, বরং জানাল, আজ এখানে সে আশীর্বাদ আর ধন্যবাদ পেয়েছে এটাই তার কাছে বড় পুরস্কার।

যে সন্তানদের আর কখনও দেখার আশা ছিল না, তাদের শেষ পর্যন্ত ফিরে

www.BanglaBook.org

পেয়েছে তারা। এর চেয়ে বেশি আর কী চাই তাদের। শারীরিক সামর্থ্য ফিরে আসলে আবার কাজ শুরু করতে পারবে তারা। ইতিমধ্যে বাজার থেকে প্রতিবেশীদের কিনে আনা দুধ, মিষ্টি আর পুরি পেট পুরে খেয়েছে তারা।

দুই বছরের পুতালি আর তিন বছর বয়সী পুনা হারিয়ে গিয়েছিল শুক্রবার দুপুরে। আর রাখাল তাদের খুঁজে পায় সোমবার বিকাল পাঁচটার দিকে। প্রায় সাতাত্তর ঘন্টার ব্যাপার; এই সাতাত্তর ঘন্টা বাচ্চাদুটো যে জঙ্গলে কাটিয়েছে সেখানে কোন্ কোন্ বন্যপ্রাণী চরে বেড়ায় তা আগেই বলা হয়েছে। আর দীর্ঘ সময়ে নিশ্চয়ই কোন হিংস্র প্রাণী কিংবা পাখি বাচ্চা দুটোকে দেখেছে, তাদের কণ্ঠস্বর শুনেছে আর গন্ধও পেয়েছে। কিন্তু যখন রাখাল লোকটা পুনা আর পুতালিকে ওদের বাবা-মার হাতে তুলে দেয় তখন তাদের শরীরে দাঁতের কামড় বা নখের আঁচড়ের একটা চিহ্নও পাওয়া যায়নি।

এ প্রসঙ্গে করবেটের নিজের একটা অভিজ্ঞতার কথা বলা: তার চোখের সামনেই একটা বাঘিনী লুকিয়ে এক বছরেরও কম বয়সী একটা বাচ্চার দিকে এগিয়ে আসছিল। জায়গাটা বেশ খোলামেলা। বাঘিনী কিছুটা দূরে থাকতেই ওটাকে দেখতে পায় বাচ্চাটা, এবং ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে শুরু করে। এবার লুকিয়ে আসার চেষ্টা ছেড়ে সরাসরি বাচ্চাটার দিকে এগিয়ে আসল বাঘটা। পশুটা যখন কয়েক গজের মধ্যে চলে আসল তখন গড়িয়ে তার কাছে চলে আসল বাচ্চাটা। তারপর গলা বাড়িয়ে দিল আর মাথা উপরে তুলল বাঘিনীর গন্ধ নেয়ার জন্য। নাকে নাক ঘষল ছোট্ট বাচ্চা আর জঙ্গলের রাণী। তারপরই, ঘুরে যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে ফিরে চলল বাঘটা। এটাই তো জঙ্গলের আইন। জঙ্গলের আইনে অসহায় দুর্বলকে কখনও আক্রমণ করে না শক্তিশালীরা। সে কারণেই বেঁচে গেল হারকুয়ারের ছেলে-মেয়েরা আর ছোট্ট সেই মানব শিশু। বিধাতা যদি মানুষের জন্যও এমন আইন করতেন তবে হয়তো পৃথিবীতে যুদ্ধ-বিগ্রহ আর হানাহানি বলতে কিছু থাকত না।

www.BanglaBook.org

## আনুগত্য

সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ৩০ মাইল, ধেয়ে চলেছে ট্রেনটা : মাইলকে মাইল নতুন সূর্য তার আলোয় রাঙিয়ে দিয়ে যাচ্ছে মাঠগুলোকে। যেখানে সোনালী গম কাটছে লোকেরা। মাসটা এপ্রিল, আর ট্রেন চলেছে ভারতের সবচেয়ে উর্বর ভূমি গাঙ্গেয় উপত্যকার মাঝখান দিয়ে। গত বছর ভারত দেখেছে ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষগুলোর একটিকে। দয়াপরবশ হয়েই কিনা কে জানে এবার নিজের খোলস বদলে ফেলেছে আবহাওয়া। শীতের আশীর্বাদ বয়ে আনা বৃষ্টি ফিরিয়ে এনেছে জমির উর্বরাশক্তি . এক বছরের প্রায় অভুক্ত লোকগুলো আগ্রহের সঙ্গে ঘরে তুলছে উর্বর ফলনের একটা ফসল। গম কাটার কাজ করছে মহিলারা বেশিরভাগই ফসল পাকার সঙ্গে সঙ্গে যাযাবরের মত কাজের খোঁজে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়ানো ভূমিহীন শ্রমিক। তাদের প্রতিদিনকার কাজ শুরু হয় একেবারে ভোরে, অবিরাম চলে যতক্ষণ আলো থাকে ততক্ষণ। আর এর মজুরি হিসাবে এই নারী শ্রমিকেরা পায় পুরো দিনে তার কাটা মোট ফসলের বারো থেকে ষোলো ভাগের এক ভাগ। দৃষ্টিপথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মত কাঁটা-ঝোপ বা জঙ্গলের কোন অস্তিত্ব নেই। যাত্রীবাহী বগির জানালা পথে কোন ধরনের যান্ত্রিক কল-কব্জা চোখে পড়ছে না করবেটের। জমি চাষের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে ষাঁড় ; প্রতিটি লাঙ্গলের সঙ্গে জোড়া হয়েছে দুটো ষাঁড়। ফসল কাটা হচ্ছে অঠারো ইঞ্চি লম্বা বাঁকানো ফলার কাস্তে দিয়ে। খড় দিয়ে বাঁধা ফসলের আঁটিগুলো ষাঁড় টানা কাঠের গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মাড়াইয়ের জন্য নির্ধারিত জায়গায় : গোবর লেপে সমতল আকার দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে ওটাকে। কেটে আনা ফসল মাড়াই হচ্ছে ষাঁড় দিয়েই। মাঝখানে একটা খুঁটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা ষাঁড়গুলো মেঝেতে স্তূপাকারে ফেলে রাখা ফসলগুলোর উপর অনবরত ঘুরছে। জমি থেকে ফসলের আঁটি সরিয়ে নেয়া হয়ে গেলে গবাদিপশুগুলোকে চরাতে নিয়ে আসছে ছোট ছেলে-মেয়ের দল। এদের সঙ্গে আসে বৃদ্ধা আর সন্তানহীন নারীরা, ফসল কাটার সময় রয়ে যাওয়া কিছু শিষের খোঁজ যদি পাওয়া যায় : টুকিয়ে টুকিয়ে যা পাবে তার অর্ধেক আবার দিয়ে দিতে হবে জমির মালিককে, বাকি অর্ধেক—সূর্যের তাপে জমি যদি বেশি ফেটে গিয়ে না থাকে তবে এর পরিমাণ হতে পারে এক থেকে দুই পাউণ্ড—সঙ্গে নেয়ার অনুমতি মিলবে।

করবেটের গন্তব্যে পৌঁছতে সময় লাগবে ৩৬ ঘণ্টা। ট্রেনে তাঁর নিজের একটা আলাদা কামরা আছে। আর নাস্তা, দুপুর এবং রাতের খাবারের জন্য থামতে হবে

www.BanglaBook.org

ওটাকে। যে পথ পাড়ি দিয়ে চলেছে ট্রেন তার প্রতিটি মাইলই চিত্তাকর্ষক। কিন্তু এর কোন কিছুই খুশি করতে পারছে না করবেটকে। কারণ তাঁর সিটের নীচে রাখা ইস্পাতের ট্রাঙ্কটায় একটা থলেতে যে ২০০ রুপি আছে তা তাঁর নিজের নয়।

আঠারো মাস আগে, যে রেলওয়েতে এখন ভ্রমণ করছেন তার একজন জ্বালানী পরিদর্শক হিসাবে নিয়োগ পান তিনি। সরাসরি বিদ্যালয় থেকে এই চাকরিতে যোগ দিয়েছেন করবেট। আর এই আঠারো মাসে জঙ্গলে থেকে লোকোমোটিভের জ্বালানী হিসাবে ব্যবহারের জন্য কাটিয়েছেন ৫ লাখ ঘনফুট কাঠ। গাছগুলো মাটিতে ফেলার পর টুকরো করা হয়েছে। প্রতিটি টুকরো ৩৬ ইঞ্চির কমও না বেশিও না। কাটার পর গরুর গাড়িতে চাপিয়ে এগুলোকে নিয়ে যাওয়া হয় দশ মাইল দূরের নিকটস্থ রেলওয়ে পয়েন্টে। সেখানে টুকরোগুলো পরিমাপ করার পর জ্বালানিবাহী ট্রেন ভর্তি করে প্রয়োজন মত পাঠানো হত বিভিন্ন স্টেশনে। জঙ্গলের একাকী এই আঠারোটা মাস ছিল প্রচণ্ড পরিশ্রমের। কিন্তু করবেট নিজেকে সুস্থ রেখেছেন, সেই সঙ্গে উপভোগও করেছেন কাজটা। পুরো জঙ্গলটাই বুনো জীব-জন্তুতে ঠাসা। ভাণ্ডায় দেখা মেলে চিত্রা হরিণ, চারশিঙ্গা অ্যান্টিলোপ, বুনো শুয়োর, ময়ূর ইত্যাদি। বনের এক দিকের সীমানা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা নদীতে আছে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, অ্যালিগেটর আর অজগর। করবেটের কাজটাই এমন যে চাইলেই দিনের বেলা শিকার কিংবা খেয়াল খুশিমত যে-কোন কাজ করার সুযোগ নেই। যার কারণে গুলি করে বন্যপ্রাণী শিকার কিংবা মাছ ধরার কাজ তাঁকে করতে হত রাতের বেলা। দিনের আলোয় শিকার আর রাতে চাঁদের আলোয় শিকারে পার্থক্য আকাশ-পাতাল। রাতে কোন হরিণ কিংবা মূল খুঁড়তে ব্যস্ত কোন শুয়োরকে অনুসরণ করা সহজ হলেও নির্ভুল নিশানায় গুলি করা খুবই কঠিন, যদি না চাঁদের আলো সরাসরি প্রাণীটার গায়ের উপর পড়ে। ময়ূর শিকার করতে হয় এদের বিশ্রাম নেয়ার সময়। করবেট বলতে লজ্জাবোধ করছেন না যে এ ধরনের শিকার কখনও কখনও তিনিও করেছেন। কারণ এই দেড় বছরে তিনি কেবল তখনই মাংসের স্বাদ পেয়েছেন যখন চন্দ্রালোকিত রাতে শিকার করেছেন। চাঁদহীন রাতগুলো তাঁকে কাটাতে হত নিরামিষভোজী হয়েই।

জঙ্গলের নানা দুর্ঘটনায় মাঝে মাঝেই এলোমেলো হয়ে যায় এর কোন কোন বাসিন্দার জীবন। আর সে সূত্রেই বেশ কিছু অনাথ আর আশ্রয়হীন পশুর দায়িত্ব নিতে হয়েছে করবেটকে। তাঁর ছোট্ট তাঁবুতে করবেটের সঙ্গেই ভাগ করে থাকত এরা। একবার সংখ্যায় বেশ বেড়ে গেল তাঁর সঙ্গীরা। দুটো তিতিরের বাচ্চা, যার একটা কালো আর একটা ধূসর, চারটা ময়ূরের বাচ্চা, দুটো খরগোশ এবং চার শিংয়ের দুটো বাচ্চা অ্যান্টিলোপ, যেগুলো কেবল তাদের লম্বা, কৃশ পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখেছে। এসময়ই তাঁর তাঁবুতে এসে আস্তানা গাড়ে রেক্স নামের একটা অজগর। সেদিন রাত নামার ঘণ্টাখানেক আগেই ফিরেছেন করবেট।

www.BanglaBook.org

এসেই চারপেয়ে প্রাণীদুটোকে দুধ খাওয়াতে বসেছেন, এমন সময় লণ্ঠনের আলোয় তাঁবুর কোনায় কিছু একটা চোখে পড়ল তাঁর। তদন্ত করতে যেতেই দেখলেন অ্যান্টিলোপের বাচ্চার বিছানা হিসাবে ব্যবহার করা খড়ের গাদার উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে অজগরটা। চমকে উঠে দ্রুত গুণতে শুরু করলেন করবেট, দেখলেন তাঁবুর একটি প্রাণীও খোয়া যায়নি। কাজেই যে কোনাটা পছন্দ করেছে সেখানেই থাকতে দিলেন তাকে। টানা দুমাসের প্রতিটি দিন সূর্য আলো ছড়াতেই ঘর থেকে বেরিয়ে যেত রেক্স, তার সেই কোণে ফিরে আসত একেবারে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর। এই সময়ের মধ্যে তাঁর সঙ্গে যেসব প্রাণী তাঁবুতে থাকত এর একটিরও কোনধরনের ক্ষতি করেনি সে।

যেসব অনাথ, আশ্রয়হীন প্রাণী আশ্রয় পেয়েছে করবেটের তাঁবুতে, নিজের দায়িত্ব নেয়ার যোগ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের প্রত্যেকেই ফিরে গেছে বনে। কেবল টিডলে-ডি-উইঙ্কস ছাড়া। চার শিঙ্গা এই অ্যান্টিলোপটা ছেড়ে যেতে রাজি হয়নি তাঁকে। জ্বালানী লোডিং তদারকি করার জন্য যখন রেল লাইনের কাছে করবেট তাঁবু সরিয়ে আনতেন, তখন তাঁকে অনুসরণ করে চলে আসত ওটা। আর এটা করতে গিয়ে আরেকটু হলে মরতেই বসেছিল ওটা। করবেটের নিজ হাতে লালিত পালিত হওয়ায় মানুষ সম্পর্কে কোন ধরনের ভয়ই জন্মায়নি ওটার মনে। তাদের আস্তানা বদলের এক দিন পর ঘটে ঘটনাটা। সে এমন একজন লোকের কাছাকাছি চলে যায় যে বন্যপ্রাণী মনে করে তাকে মারার চেষ্টা করে। সেদিন সন্ধ্যায় তাঁবুতে ফিরে তাঁর বিছানার কাছে পড়ে থাকতে দেখলেন ওটাকে করবেট। আর উঁচু করে তুলে ধরতেই আবিষ্কার করলেন তার সামনের দুটো পা-ই ভেঙে গেছে। পায়ের ভাঙা অংশ ঝুলছে চামড়া থেকে। প্রাণীটার গলা দিয়ে কিছুটা দুধ ঢেলে দিয়ে তাঁর যতটুকু জানা আছে তাই করার সাহস সঞ্চয় করতে শুরু করলেন তিনি। এমন সময় একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে আসল করবেটের ভৃত্য, সে অসহায় প্রাণীটাকে মারার চেষ্টা করার কথা স্বীকার করেছে। লোকটার কাছ থেকে জানা গেল জমিতে কাজ করছে এমন সময় টিডলে-ডি-উইঙ্কস কাছে আসে তার। প্রাণীটা পথ ভুলে কাছের জঙ্গল থেকে এদিকে চলে এসেছে মনে করে লাঠি দিয়ে এটাকে মারে সে, তারপর পিছু ধাওয়া করে। আর যখন এটা তাঁর তাঁবুতে প্রবেশ করে তখনই কেবল ওটা যে একটা পোষা প্রাণী তা বুঝতে পারে সে। করবেট এসে পৌঁছবার আগেই মনে মনে তাকে কেটে পড়ার পরামর্শ দেয় ভৃত্য। কিন্তু তা করতে অস্বীকার করে লোকটা। তার গল্পটা শোনাবার ফাঁকেই সে জানাল আগামী দিন সকালে গ্রাম থেকে সঙ্গে করে একজন হাড় জোড়া দেওয়ার বদ্যি নিয়ে আসবে সে। কেবল ওটার জন্য নরম একটা বিছানা তৈরি করে দেয়া আর একটু পর পর দুধ খাওয়ানো ছাড়া, আহত প্রাণীটার জন্য কিছুই আর করার থাকল না করবেটের। সকালে সত্যি সত্যি হাড় জোড়া লাগায় এমন একজন লোক নিয়ে

www.BanglaBook.org

হাজির হলো সে।

শুধুমাত্র বেশভূষা আর বাইরের অবস্থা দেখে তারতে কোন মানুষ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছা বোকামি। হাড়জোড়া লাগিয়ে দুর্বল, বুড়ো একজন মানুষ। তার চেহারা আর পুরনো, শতচ্ছিন্ন কাপড়ে দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু সে কোন অংশেই একজন বিশেষজ্ঞের চেয়ে কম নয়। আহত প্রাণীটাকে তুলে ধরতে বলল সে করবেটকে। কয়েক মিনিট এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল প্রাণীটার দিকে। তারপর ঘুরে তাঁবু থেকে বের হয়ে গেল এবং ঘাড় ফিরিয়ে বলল দুই ঘন্টার মধ্যে ফিরে আসছে সে। করবেট আজ সকালটা রেলওয়ের কাজ থেকে ছুটি নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। লোকটা ফিরবার আগেই কাছের জঙ্গল থেকে কিছু লাঠি কেটে নিয়ে আসলেন। তাঁবুর কোনায় ছোট্ট একটা ঘেরের মত তৈরি করলেন এগুলো দিয়ে। একটু পরেই ফিরে এল লোকটা। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে ছাল ছাড়ানো বেশ কিছু পাট খড়ি, বেশ কতটুকুন সবুজ মলম, একটুকরো প্রায় থালার আকৃতির রেড়ি গাছের পাতা আর পাটের দড়ি। টেবলে-ডি-উইঙ্কসকে হাঁটুতে নিয়ে বিছানার কিনারে বসলেন করবেট। প্রাণীটার দেহের ভর কিছুটা সামলাচ্ছে তার পেছনের পা জোড়া বাকিটা করবেটের হাঁটু। এবার তার জিনিসপত্তর সহ অ্যান্টিলোপটার কাছে এসে বসল হাড় জোড়া লাগিয়ে। বাচ্চাটার সামনের দুটো পার হাড়ই হাঁটু এবং খুরের মাঝখানে থেকে ভেঙে গেছে, পায়ের ঝুলন্ত অংশদুটো কেবলই নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে। খুব সাবধানে মোচড় খেতে থাকা পা দুটোকে সোজা করল সে এবার হাঁটু থেকে খুর পর্যন্ত জায়গাটা ঢেকে দিল সবুজ মলমের একটা পুরু আস্তরণ দিয়ে। মলমগুলো যেন জায়গামত থাকে সেজন্য এর উপর লাগিয়ে দিল রেড়ির পাতা। সব শেষে এই পাতার উপর পাটখড়িগুলো বসিয়ে পাটের দড়ি দিয়ে পায়ের সঙ্গে বেঁধে দিল ওগুলোকে।

পরদিন সকালে আবার পাট খড়ি জোড়া লাগিয়ে তৈরি করা লাঠি নিয়ে উপস্থিত হলো লোকটা। আর এগুলো যখন টিডলে-ডি-উইঙ্কসের পায়ের সঙ্গে লাগানো হলো, হাঁটু বাঁকা করতে এবং খুর মাটিতে ফেলতে পারল সে। খুরগুলো লাঠি ছাড়িয়ে প্রায় এক ইঞ্চি মত বেরিয়ে আছে মাটির দিকে। হাড় জোড়া লাগিয়ের মজুরি এক রুপি; মলম তৈরির উপাদান আর দড়ির রশি বাজার থেকে কেনার দাম বাবদ খরচ আরও দুই আনা; তবে লাঠিদুটো যতদিন না সরানো হলো এবং অ্যান্টিলোপের বাচ্চাটা আবার আগের মত চলাফেরা করতে পারল ততদিন তার মজুরি কিংবা উপহার বাবদ কোন কিছু গ্রহণ করতে দৃঢ়ভাবে অসম্মতি জানিয়ে গেল লোকটা।

করবেটের এই কাজ, যার প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছেন তিনি এখন শেষ হয়েছে। আর খরচ করা অর্থ-কড়ির হিসাব দাখিল করতে এখন তিনি ফিরে চলেছেন হেডকোয়ার্টারে। একই সঙ্গে নতুন একটি চাকরি খোঁজের আতংকও

www.BanglaBook.org

পেয়ে বসেছে তাঁকে, কারণ লোকোমটিভ এখন রূপান্তরিত হয়েছে কয়লা চালিত ইঞ্জিনে। জ্বালানী হিসাবে কাঠের প্রয়োজনও তাই ফুরিয়েছে। এমনিতে অবশ্য করবেটের কাগজ-পত্তরে হিসাব সব ঠিকই আছে। তাঁর নিজেরও মনে হয় দায়িত্ব বেশ চমৎকারভাবেই পালন করতে পেরেছেন তিনি ; কারণ যে কাজ করতে প্রায় দুই বছর লেগে যাবে বলে ধারণা করা হয়েছে আঠারো মাসেই তা শেষ করে ফেলেছেন করবেট . তারপরও একটা অস্বস্তি তাড়া করে বেড়াচ্ছে তাঁকে। কারণ আর কিছু নয় ইস্পাতের ট্রাঙ্কের টাকার থলেটা।

গন্তব্য সমাপ্তিপুরে পৌঁছলেন সকাল নয়টার দিকে। বাক্স পেঁটরা ওয়েটিং রুমে রেখে হিসাবের বই আর দুইশ' রুপির থলেটা সহ তিনি যে বিভাগে কাজ করতেন তার প্রধানের অফিসের দিকে রওয়ানা হলেন করবেট ; সেখানে বেশ ধোপদুরস্ত পোশাকের একজন দারোয়ান তাঁকে জানাল সার ব্যস্ত আছেন, অপেক্ষা করতে হবে তাঁকে। খোলা বারান্দায় বেশ গরম লাগছে। আর সময় যত গড়াতে লাগল করবেটের দুশ্চিন্তা তত বাড়তে লাগল ; কারণ তাঁর হিসাবের বই মিলাতে সাহায্য করা সেই বুড়ো রেল কর্মচারী তাঁকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছে, হিসাব বুঝিয়ে দেয়ার পর, তাঁর এই বাড়তি দুইশ' রুপী থাকার কথা যখন স্বীকার করবেন তখন বড় ধরনের সমস্যায় পড়ে যেতে পারেন করবেট। এরই মধ্যে দরজা খুলে খুব কর্কশ চেহারার একজন লোক বেরিয়ে এল। এবং দারোয়ান দরজা লাগিয়ে দেবার আগেই ভারী একটা কণ্ঠস্বর ভেতরে আসতে বলল করবেটকে। বাংলা এবং রেঙ্গুনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লোকোমোটিভ বিভাগের প্রধান রাইলেজ ষোলো স্টোন ওজনের বিশালদেহী একজন মানুষ। লোকটার বাজখাঁই কণ্ঠস্বর তাঁর অধীনে কাজ করা কর্মকর্তা কর্মচারীদের অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিলেও একই সঙ্গে তিনি মানুষ ভালই। করবেটকে বসতে বলে হিসাবের খাতাগুলো নিজের দিকে টেনে নিলেন তিনি। তারপর একজন ক্লার্ককে ডেকে যে সব স্টেশনে জ্বালানী পাঠানো হয়েছে সেখান থেকে আসা হিসাবগুলোর সঙ্গে তাঁর হিসাবগুলো মিলিয়ে দেখতে শুরু করলেন সতর্কতার সঙ্গে। তারপর জানালেন দুঃখের সঙ্গে তাঁকে জানাতে হচ্ছে করবেটকে আর তাঁদের প্রয়োজন নেই। আজ দিনের কোন সময় কর্মচ্যুতির নির্দেশ পৌঁছে যাবে তাঁর কাছে। তারপরই সাক্ষাৎকার পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন তিনি। মেঝে থেকে টুপিটা তুলে নিয়ে রওয়ানা হতে উদ্যত হলেন করবেট, এমন সময় পিছন থেকে ডেকে বললেন টেবিলের উপর টাকার একটা থলে ফেলে যাচ্ছেন তিনি ভুল করে। এই দুইশ' রুপি এখানে এভাবে রেখে চলে যেতে পারবেন এটা ভাবা উচিত হয়নি করবেটের, কিন্তু রাইলেজ যখন তাঁকে ডাকলেন তখন এটাই করার চেষ্টা করছিলেন তিনি। কী আর করা, ফিরে এসে জানালেন টাকাটা আসলে রেলওয়ের সম্পত্তি ; আর যেহেতু তাঁর জানা নেই কীভাবে এটা হিসাব খাতায় যোগ করবেন

www.BanglaBook.org

তাই নিয়ে এসেছেন তাঁর কাছে। "তোমার হিসাব তো মিলানো আছে" বললেন রাইলেজ। "যদি তুমি জালিয়াতি না করে থাকো তবে এর একটা ব্যাখ্যা চাইব আমি"। প্রধান কেরানি তেওয়ারি এক গাদা কাগজ নিয়ে কামরায় প্রবেশ করলেন। করবেট তখন রাইলেজকে নীচের ব্যাখ্যাটা দিচ্ছেন, দয়ালু চোখে তাকিয়ে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করে গেলেন তিনি।

করবেটের কাজ তখন প্রায় শেষ পর্যায়ে, এমন সময় এক রাতে, জঙ্গল থেকে রেল লাইনের দিকে জ্বালানী নিয়ে যাওয়া ১৫ জন গরুর গাড়ি চালক এল তাঁর কাছে ; তারা জানাল ফসল কাটতে গ্রামে ফিরে যাওয়ার জন্য জরুরী তলব করা হয়েছে তাদের। এদিকে যে জ্বালানীগুলো তারা গাড়ি করে পৌঁছে দিয়েছে সেগুলো ছড়িয়ে আছে বিরাট একটা এলাকা জুড়ে। এগুলোর হিসাব করতে বেশ কয়েক দিন লেগে যাবে, অতএব মোটামুটি একটা হিসাব কষে তাদের পাওনা মিটিয়ে দেয়ার অনুরোধ করল তারা করবেটকে। কারণ যে করে হোক আজ রাতেই রওয়ানা হতে হবে তাদের। এটা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন এক রাত। আর এর মাঝে প্রতি ঘন ইঞ্চি জ্বালানী হিসাব করে তাদের পাওনা মেটানো রীতিমত অসম্ভব। অতএব করবেট জানালেন তাদের হিসাবই মেনে নেবেন তিনি। দুই ঘণ্টা বাদে রওয়ানা হলো তারা, এবং পাওনা টাকা বুঝিয়ে দেয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে রাতের নিস্তব্ধতা চিরে তাদের গাড়ি এগিয়ে চলার শব্দ শুনতে পেলেন করবেট। কয়েক সপ্তাহ বাদে যখন জ্বালানী জড়ো এবং পরিমাপ হলো, করবেট আবিষ্কার করলেন তাদের প্রাপ্য থেকে ২০০ টাকা কম হিসাব করেছিল তারা। কিন্তু এই টাকা লোকগুলোকে ফিরিয়ে দেয়ার কোন সুযোগ নেই করবেটের। নিজেদের কোন ঠিকানাই রেখে যায়নি তারা।

করবেটের গল্পটা শুনে রাইলেজ জানালেন এজেন্ট ইজাতের আগামীকাল আসবার কথা রয়েছে। বিষয়টা নিয়ে তিনি কথা বলবেন তার সঙ্গে।

ভারতের সবচেয়ে জাঁকালো তিনটি রেলওয়ের এজেন্ট ইজাত পৌঁছল পর দিন সকালে। দুপুর নাগাদ রাইলেজের অফিসে যাওয়ার ডাক পেলেন করবেট। যখন অফিসে ঢুকলেন তখন ইজাত একাই রয়েছে সেখানে। লোকটা ছোটখাট গড়নের হলেও সাজপোশাক বেশ চমৎকার, চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। শুরুতেই সময়ের ছয় মাস আগেই কাজ শেষ করে ফেলায় করবেটকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন রাইলেজ তাকে হিসাবগুলো দেখিয়েছে এবং একটা রিপোর্ট দিয়েছে। আর এ কারণেই একটা প্রশ্ন করতে চান তিনি এখন। সেটা হলো, কেন এই দুইশ' রুপি পকেটে পুরে ফেললেন না করবেট এবং এই ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য করা থেকে বিরত থাকলেন না। করবেটের উত্তর নিশ্চিতভাবেই সন্তোষজনক ছিল। কারণ সেদিন সন্ধ্যায় অনিশ্চয়তা নিয়ে স্টেশনে অপেক্ষা করার সময় দুটো চিঠি পেলেন তিনি। এর একটা এসেছে তেওয়ারির কাছ থেকে, রেলওয়ে

www.BanglaBook.org

চাকুরেদের বিধবা এবং এতিম তহবিলে ২০০ রুপি যোগ করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে। তেওয়ারি আবার এর অনারারি সচিব। অপরটি এসেছে তাঁর চাকরির মেয়াদ বাড়ানোর খবর জানিয়ে ইজ্জতের কাছ থেকে। সেই সঙ্গে কাজের জন্য রাইলেজের কাছে রিপোর্ট করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এতে।

পরবর্তী একটি বছর রেলওয়ের এ মাথা থেকে ওমাথা কত ধরনের কাজ করার অভিজ্ঞতাই না হলো করবেটের। এর মধ্যে একটা ছিল কতটুকুন কয়লা ব্যবহার করা হয়েছে তা রিপোর্ট করার জন্য লোকোমোটিভের চালক দাঁড়ানোর জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার কাজ। এটা ছিল করবেটের ভারী পছন্দের একটা কাজ, কারণ এতে গাড়ি চালাবার সুযোগ ছিল তাঁর। আবার এক সময় করতে হয়েছে মালগাড়ির প্রহরীর চাকরি। প্রচণ্ড বিরক্তিকর একটা কাজ। রেলে লোকের অভাব থাকায় অনেক সময়ই টানা ৪৮ ঘণ্টা ডিউটি করতে হতো তাঁর। আবার কখনও বা করতে হয়েছে সহকারী ভাণ্ডার রক্ষক কিংবা সহকারী স্টেশন মাস্টারের কাজ। তারপরই একদিন মোকামেহ ঘাটে যাবার এবং ফেরি তত্ত্বাবধায়ক স্টোরারের সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ পেলেন করবেট। বাংলা এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ে গঙ্গা নদী থেকে বিভিন্ন দূরত্বে ছুটে চলেছে গাঙ্গেয় উপত্যকার মধ্য দিয়ে। আর কোন কোন ক্ষেত্রে মূল লাইন থেকে বের হয়ে আসা শাখা লাইন সোজা চলে গেছে নদীর দিকে। আর এ ক্ষেত্রে ফেরির মাধ্যমে এ প্রান্তের শর্ট গেজ রেল যুক্ত হয়েছে ডান তীরের ব্রড গেজ রেলের সঙ্গে। আর এই সংযোগগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গঙ্গার ডান তীরের মোকামেহ ঘাট।

সকালের প্রথমভাগেই সমাস্তিপুর ছাড়লেন করবেট এবং এস.এস. গোরাখপুর নামের একটা ট্রেনে চেপে পৌঁছলেন শাখা লাইনের সর্বশেষ স্টেশন সামারিয়া ঘাটে। তারপর নদী পার হয়ে মোকামেহ ঘাটে। স্টোরারকে তাঁর আসার সংবাদ জানানো হলেও বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি। এদিকে করবেটের নিজেরও জানা নেই কেন মোকামেহ ঘাট এসেছেন তিনি। দিনের পুরো সময়টা তাঁরা কাটালেন স্টোরারের বাড়িতে আর রেলওয়ের প্রসারিত ছাউনির নীচে হাঁটাহাঁটি করে, যেখানে মালামালের রীতিমত স্তূপ জমে গেছে। দুই দিন বাদে রেলওয়ে সদরদপ্তর গোরাখপুর থেকে ডেকে পাঠানো হলো তাঁকে, সেই সঙ্গে জানানো হলো ট্রান্স-শিপমেন্ট পরিদর্শক হিসাবে মোকামেহ ঘাটে নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাঁকে। অর্থাৎ তাঁর বেতন মাসিক একশ' রুপি থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ১৫০ রুপিতে। আর মালামাল পারাপার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব বুঝে নিতে হবে করবেটকে ঠিক এক সপ্তাহ পর।

গোরাখপুর থেকে আবার ফিরে আসলেন মোকামেহ ঘাটে। তবে এবার এসেছেন রাতে, এসেছেন এমন একটা চাকুরি নিয়ে যার সম্পর্কে কোন ধারণা নেই তাঁর, আর কোথায় একজন শ্রমিক পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা

www.BanglaBook.org

ছাড়াই ঘাড়ে নিতে চলেছেন কঠিন এক দায়িত্ব। সবচেয়ে বড় কথা তাঁর কাছে মূলধন বলতে আছে কেবল গত আড়াই বছরের সঞ্চয় ১৫০ টাকা।

এবার স্টোরার আশা করেননি তাঁকে। কিন্তু করবেটকে ডিনার করালেন তিনি। তাঁর এখানে আসার কারণ খুলে বলার পর চেয়ার নিয়ে বারান্দায় এসে বসলেন দু'জন। নদীর দিক থেকে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে। শেষ রাত পর্যন্ত কথা বললেন তাঁরা। স্টোরার করবেটের দ্বিগুণ বয়েসী এবং গত কয়েক বছর ধরে মোকামেহ ঘাটে আছেন। বাংলা এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ে ফেরি তত্ত্বাবধায়কের কাজে নিয়োগ করে তাঁকে। সামারিয়া ঘাট এবং মোকামেহ ঘাটের মধ্যে মিটার গেজ বগি আর লোকজন আনা নেয়া করা এমন বেশ কয়েকটা স্টীমার আর বার্জের দায়িত্বে আছেন তিনি। তাঁর থেকে করবেট জানলেন বাংলা এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের শতকরা আশি ভাগ দূরপাল্লার যাত্রী আর মালামাল পার হয় মোকামেহ ঘাট দিয়ে। এবং প্রতি বছর মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর এই সময়টা মালামালের প্রচণ্ড জটলা সৃষ্টি হয় এখানে, যার কারণে প্রচণ্ড ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয় রেলওয়েকে।

মোকামেহ ঘাটের দুই রেলওয়ের (ব্রডগেজ এবং মিটার গেজ লাইন) মধ্যে মালামাল পরিবহনের কাজ এতদিন করে এসেছে লেবার কোম্পানি নামের একটি বড় প্রতিষ্ঠান। পুরো ব্রডগেজ রেলওয়ের মালামাল আনা-নেয়ার কাজ করে তারাই। স্টোরারের ধারণা অনুসারে মিটার গেজ রেলওয়ের প্রতি এই কোম্পানির অনাগ্রহ এবং গাঙ্গেয় উপত্যকায় ফসল পাকার কারণে এই মৌসুমে শ্রমিক সঙ্কটই বার্ষিক এই মালামাল জটলার সৃষ্টির কারণ। বিষয়গুলো পরিষ্কার করে এবার তিনি প্রশ্ন রাখলেন কীভাবে এখানকার লোকদের কাছে একেবারে অপরিচিত, সেই সঙ্গে এই সামান্য মূলধন সম্বল করে করবেটকে এই কাজে পাঠানো হয়েছে, যেখানে তাদের সমস্ত সম্পদ নিয়ে লেবার কোম্পানি কাজটা করতে ব্যর্থ হয়েছে। মোকামেহ ঘাটের ছাউনিগুলো ইতিমধ্যে ছাদ পর্যন্ত ভরে গেছে মালামালে, যোগ করলেন তিনি। খালাস হওয়ার জন্য উঠোনে অপেক্ষায় আছে আরও চারশ' ওয়াগন। নদীর ওধারে ফেরি পারাপারের প্রতীক্ষায় থাকা এক হাজার ওয়াগনের কথা নাহয় বাদই দেয়া হলো। "আমার পরামর্শ হলো, পরের স্টীমারে চেপে সামারিয়া ঘাটে চলে যাও, তারপর সোজা গোরাখপুর। রেলওয়েকে জানাও এই চুক্তির বিষয়ে কিছুই করার নেই তোমার।" এই বলে কথা শেষ করলেন স্টোরার।

পর দিন সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়লেন করবেট। কিন্তু তখনই সামারিয়া ঘাটমুখী স্টিমার ধরলেন না। এর বদলে ছাউনি আর মালামাল রাখার চত্বরে চলে এলেন পরিস্থিতি যাচাই করতে। স্টোরার মোটেই রং চড়াননি। বরং যা বলেছেন অবস্থা তার চেয়েও খারাপ। চারশ' মিটার গেজ ওয়াগনের পাশাপাশি চারশ' ব্রডগেজ ওয়াগনও খালাসের অপেক্ষায় আছে সেখানে। মোটামুটি একটা

www.BanglaBook.org

হিসাব করে করবেট অনুমান করলেন মোকামেহ ঘাটে আনুমানিক প্রায় ১৫ হাজার টন মালামাল আছে, আর তাকে এখানে পাঠানো হয়েছে পাহাড় সমান এই বোঝা পরিষ্কারের জন্য। করবেটের বয়স তখনও একশ পুরেনি। সবে শুরু হয়েছে গ্রীষ্মকাল। এসময়ে সবার মধ্যে একটু পাগলামির ভাব আসে। অতএব রাম সারানের সঙ্গে যখন দেখা হলো ততক্ষণে করবেট সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন কাজটা করবেন তিনি, পরিণতি যা-ই হোক না কেন।

গত দুই বছর ধরে মোকামেহ ঘাটের পোস্ট মাস্টারের দায়িত্ব পালন করে আসছেন রাম সারান। কুচকুচে কালো দাড়ির এই লোকটা পাঁচ সন্তানের জনক এবং বয়সে করবেটের চেয়ে অন্তত বিশ বছরের বড়। টেলিগ্রামে করবেটের আসবার খবর জানানো হয়েছে তাঁকে, কিন্তু তিনি যে মালামাল সামলানোর দায়িত্ব নিয়ে আসছেন জানা ছিল না তাঁর। করবেট যখন সংবাদটা দিলেন তাঁকে, মুখটা হাসিতে ভরিয়ে তুলে বললেন, "ভাল সার, খুব ভাল। আমরা এটা সামলে নেব।" এই আমরা শব্দটা শুনে রাম সারানের প্রতি অপরিসীম এক উষ্ণতায় ভরে গেল করবেটের মন, তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৫ বছর শীতল হয়নি যা। সকালের নাস্তার সময় তাঁর কাজটা নেয়ার সিদ্ধান্তের কথা স্টোরারকে জানাতে বললেন: বোকারা কখনও ভাল পরামর্শ গ্রহণ করে না। তবে তাঁর পক্ষে যতটা সম্ভব সাহায্য তিনি করবেন এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন তিনি পরবর্তীতে। পরের কয়েকটা মাস করবেটের মালামাল পারাপারের জন্য দিবা-রাত্রি ফেরি চালু রাখেন স্টোরার।

গোরাখপুর থেকে মোকামেহ ঘাট আসতে সময় লাগে দুই দিন। কাজেই তাঁর কাজ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়ার এবং দায়িত্ব বুঝে নেয়ার ব্যবস্থা করার জন্য হাতে পাঁচ দিন সময় পেলেন করবেট। প্রথম দুই দিন তাঁর কর্মচারীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে কাটালেন, যাঁদের মধ্যে স্টেশন মাস্টার রাম সারান ছাড়াও আছেন একজন সহকারী স্টেশন মাস্টার, চ্যাটার্জি নামের করবেটের দাদার বয়সী একজন বৃদ্ধ, ৬৫ জন কেরানী এবং ১০০ জন শান্টার আর পয়েন্টসম্যান (এক লাইন থেকে অন্য লাইনে রেলগাড়ি সরিয়ে নেয় যেসব লোক) এবং প্রহরী। করবেটের আওতাধীন এলাকা হচ্ছে নদী পার হয়ে একেবারে সামারিয়া ঘাট পর্যন্ত আর এর মধ্যে তাঁর অধীনে আছে আর শ' খানেক লোক। এই দুই ধরনের কর্মচারীদের তত্ত্বাবধায়ন করা এবং মালসামলগুলোর তদারকি করা এমনিতেই কষ্টকর এক কাজ। তাঁর উপর আবার আছে মোকামেহ ঘাট হয়ে প্রতি বছর পারাপার হওয়া ৫ লাখ টন মালামাল পরিবহনের কাজ ঠিকঠাক মত চালিয়ে নেয়ার জন্য প্রয়োজন মাফিক শ্রমিকের যোগান দেয়া।

বড় লেবার কোম্পানি কাজ হিসাবে টাকা দেয়ার চুক্তিতে লোক নিয়োগ করত, ঘণ্টা হিসাবে নয়। আর যেহেতু মোকামেহ ঘাটের সব কাজই স্থির হয়ে

www.BanglaBook.org

আছে এখন, বেশ কিছু বেকার অসুখী শ্রমিককে রেজই বসে থাকতে দেখা যায় ছাউনির নীচে। যখন জানতে পারল মিটার গেজ রেলওয়ের দায়িত্ব নিতে চলেছেন করবেট, তখন তাঁর হয়ে কাজ করতে চাইল এদের অনেকেই। লেবার কোম্পানির লোকদের কাজে নিতে পারবেন না এমন কোন কথা দেননি করবেট। তবে বুঝলেন, ভাবনা চিন্তা না করে এখনই হুটহাট এ ধরনের কোন সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত হবে না। তবে তাদের আত্মীয় স্বজনদের কাজে না নেয়ার কোন কারণ দেখলেন না। কাজেই হাতে যে সময় আছে তাঁর প্রথম তিন দিনে বারো জন লোক বাছাই করে তাদের সর্দার হিসাবে নিয়োগ দিয়ে দিলেন করবেট। বারো জন সর্দারের এগারোজনের প্রত্যেকে মালামাল উঠানো নামানোর কাজ করবে এমন দশ জন করে লোকের দায়িত্বে থাকবে। আর বারো নম্বর লোকটি কয়লা আনা নেয়া করা নারী-পুরুষের ৬০ জনের একটা মিশ্র দলের দায়িত্বে থাকবে। শ্রমিকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আছে। আর তাই বিভিন্ন ধরনের মালের সঙ্গে কাজ করার জন্য নিয়োগ দেয়া হলো ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের। করবেট সর্দার হিসাবে লোক নিয়োগ দিয়েছেনও বিষয়টি মাথায় রেখে। এদের মধ্যে আট জন হিন্দু, দুইজন মুসলমান এবং অন্য দুইজন নিম্নবর্ণের লোক। আর যেহেতু এই বারো জনের কেবল একজন শিক্ষিত তাদের হিসাব-নিকাশ দেখার জন্য একজন হিন্দু এবং একজন মুসলমান কেরানিকে ও কাজে নিলেন করবেট।

পর দিন সকালে গোয়ালন্দের টেলিগ্রাম করে করবেট জানিয়ে দিলেন ট্রান্সশিপমেন্ট পরিদর্শক হিসাবে কাজ শুরু করতে চলেছেন তিনি এবং দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

নদীর অন্য পারে ব্রডগেজ রেলওয়ের স্টেশন মাস্টার টম কেলি নামের এক আইরিশ। গত কয়েক বছর ধরেই মোকামেহ ঘাটে আছে কেলি। করবেটের সাফল্যের বিষয়ে মনে ঘোরতর সন্দেহ থাকলেও যেভাবে সম্ভব করবেটকে সাহায্য করার প্রস্তাব দিলেন তিনি। মালপূর্ণ ছাউনি, দুই পাশের রেলওয়েতে খালাসের অপেক্ষায় আছে চারশ'টা ওয়াগন—এই যখন অবস্থা তখন যে কাউকে অসম্ভব একটা কিছু করে দেখাতে হয়। অতএব তা-ই করার সিদ্ধান্ত নিলেন করবেট। কেলির সঙ্গে যুক্তি করে নিজের এক হাজার টন গম ছাউনি থেকে বের করে বাইরের খোলা জায়গায় রাখার ঝুঁকি নিলেন তিনি। ফলে মুক্ত হওয়া ওয়াগনগুলোর সাহায্যে কেলির এক হাজার টন লবণ আর চিনি রাখার জন্য একটু জায়গা বের করা সম্ভব হবে। আর কেলি তখন তাঁর মুক্ত ওয়াগনগুলোর সাহায্যে করবেটের জন্য একটু জায়গা পরিষ্কার করে দেবেন। পরিকল্পনা অনুযায়ীই এগুলো সব কিছু। তবে করবেটের ভাগ্যই বলতে হবে, তাঁর এক হাজার টন গম খোলা আকাশের নীচে থাকা অবস্থায় একদিনের জন্য হলেও বৃষ্টি নামেনি। আর এই দশ দিনে তাঁরা ছাউনি খালি করে জায়গা তৈরি করার পাশাপাশি এমনকী বেশ কিছু

www.BanglaBook.org

ওয়াগনও খালি করে ফেলতে পারলেন। আর এই সূত্রে কেলি এবং করবেট আবার মোকামেহ ঘাট হয়ে মালামাল বুকিং শুরু করার পরামর্শ দিতে পারলেন তাঁদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে, গত দুই সপ্তাহ বন্ধ ছিল সেটা।

করবেট কাজটা পেয়েছেন গ্রীষ্মের শুরুতে। যখন ভারতীয় রেলওয়েতে মালসামান আর মানুষের চাপ থাকে সবচেয়ে বেশি। আর বুকিং পুনরায় চালু হওয়ার পর যেন ঢল নামল মালামালের। একদিকে ভাটির থেকে বাংলা আর উত্তর-পশ্চিম রেলওয়ে অন্য দিকে ব্রডগেজ রেলওয়ে স্রোতের মত মোকামের ঘাটে উগরে দিতে লাগল মানুষ আর মালামাল। চুক্তিতে তাঁকে যে রেট দেয়া হয়েছে তা ভারতের অন্য যে কোন কন্ট্রাক্টরের রেটের চেয়ে কম। মোকামেহ ঘাটের সব কাজই হলো পিস ওয়ার্ক অর্থাৎ কাজ অনুসারে ভাতা পাবে শ্রমিকেরা। আর তাঁর শ্রমিকদের ধরে রাখার কেবল একটি উপায়ই জানা আছে করবেটের। তা হলো যত সম্ভব কম লোক নিয়োগ দেয়া এবং তাদের দিয়ে যত বেশি সম্ভব কাজ করিয়ে নেয়া, যেন একই ধরনের কাজ করছে এমন অন্য শ্রমিকদের চেয়ে বেশি, অন্তত তাদের সমান কামাই করতে পারে তাঁরা। এবং প্রথম সপ্তাহের শেষেই করবেট আর তাঁর লোকেরা রীতিমত উল্লসিত হয়ে আবিষ্কার করলেন কাগজের হিসাব অনুসারে লেবার কোম্পানির লোকদের চেয়ে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বেশি অর্থ উপার্জন করেছে তারা।

যেহেতু রেলওয়ের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছে তাতে তাঁকে প্রতি সপ্তাহে পাওনা মিটিয়ে দেয়ার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে তাই করবেটও তাঁর লোকদের সপ্তাহ শেষে পাওনা পরিশোধ করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এদিকে কথা দেয়ার সময় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ভুলে বসেছিল একজন কন্ট্রাক্টর থেকে অন্য কন্ট্রাক্টরের কাছে কাজ হস্তান্তর করে তাদের হিসাব বিভাগের কাজে জটিলতা সৃষ্টি করে ফেলেছে তারা। আর এটা সমাধান করতে সময়ের প্রয়োজন। রেলওয়ের জন্য এটা অতি সাধারণ এক বিষয়। কিন্তু করবেটের জন্য নয়। মোকামেহ ঘাটে যখন আসেন তখন করবেটের কাছে পুঁজি বলতে মোটে দেড়শ' রুপী। আর গোটা পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যার থেকে কিছু ঋণ করতে পারেন তিনি। অর্থাৎ রেলওয়ে টাকা না দিলে কোনও মতেই লোকদের পাওনা পরিশোধ করা সম্ভব না তাঁর পক্ষে।

এই গল্পটার নাম করবেট দিয়েছেন আনুগত্য এবং তিনি মনে করেন না তাঁর চেয়ে বেশি আনুগত্য আর কেউ পেয়েছে। এখানে প্রথম তিনটি মাস এই আনুগত্য যে শুধু তাঁর শ্রমিকদের থেকে পেয়েছেন তা নয়, পেয়েছেন রেলওয়ের কর্মচারীদের কাছ থেকেও। করবেট মনে করেন না এই লোকগুলো সবসময় এত পরিশ্রম করত। প্রতিদিন ভোর চারটায়, এমনকী সাপ্তাহিক ছুটির দিন এবং রোববার-গুলোয়ও, বিরতিহীনভাবে কাজ চলত রাত আটটা পর্যন্ত। মালামালের হিসাব দেখা আর লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বে থাকা কেরানিরা খেত ভিন্ন ভিন্ন সময়

www.BanglaBook.org

যেন কাজ থেমে না থাকে। এদিকে শ্রমিকের জন্য তাদের স্ত্রী, বোন কিংবা মায়েরা খাবার নিয়ে আসত। ছাউনির ভিতরে বসেই খেয়ে নিত তারা। তখনকার দিনে কোন শ্রমিক সংগঠন ছিল না, ছিল না আগের যুগের মত কোন দাস বা দাসমালিক। প্রত্যেকটি লোকেরই ছিল তার ইচ্ছামত কম কিংবা বেশি কাজ করার স্বাধীনতা। আর প্রত্যেকেই কাজ করত আনন্দ আর উল্লাসের সঙ্গে। তার পরিবারের খাবার আর পোশাক-আশাকের যোগানের জন্য কিংবা হালে পুরানো শীর্ণদেহী ষাঁড়টার বদলে নতুন একটা জুড়ে দেয়ার মত কিংবা ঋণের অর্থ পরিশোধের জন্য তা যথেষ্ট কিনা তার ধার ধারত না এই লোকগুলো। তবে যা ছাড়া কোন লোক কাজ করতে পারে না সেই উৎসাহের কোন কমতি ছিল না তাদের মধ্যে। তবে শ্রমিকদের দিনকার কাজ শেষ হওয়ার পরও রেহাই মেলে না করবেট কিংবা রাম সারানের। তাঁদের হিসাব পাঠাতে হয়। পরের দিনের কাজের পরিকল্পনা এবং যোগাড়-যন্ত্র করতে হয়। আর এই প্রথমদিককার তিনটি মাস তাঁদের দু'জনের কেউই রাতে চার ঘন্টার বেশি বিছানায় পিঠ লাগাতে পারেননি। করবেট এখনও একুশে পৌঁছেননি, কাজেই তিনি ইস্পাতের মতই শক্ত। কিন্তু রাম সারানের বয়স তাঁর চেয়ে ২০ বছর বেশি এবং এই বয়সে এসে স্বাভাবিক ভাবেই অনেকটা নরম হয়ে পড়েছেন তিনি। তিন মাসের এই ঝড়ের পর দেখা গেল তাঁর ওজন এক স্টোন কমে গেছে, তবে একটুও কমেনি তাঁর কিশোরসুলভ উচ্ছলতা।

অর্থসংকট একটা ক্রমাগত দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে করবেটের জন্য। আর একটার পর এক সপ্তাহ ঘুরে চলার সঙ্গে সঙ্গে এটা রূপ নিল ভয়াবহ দুঃস্বপ্নে, যেটা কখনওই ছেড়ে যায় না তাঁকে। প্রথমে সর্দার এবং তারপর শ্রমিকেরা তাদের স্বল্প মূল্যের যৎসামান্য গহনাগাটিগুলো বন্ধক রেখে পেট চালানোর চেষ্টা করল। কিন্তু তারপর শেষ হয়ে গেল সবই। পরিস্থিতি আরও খারাপ করে দিল লেবার কোম্পানির লোকেরা। করবেটের লোকেরা তাদের চেয়ে বেশি পয়সা কামাই করছে এটা জেনে এতদিন হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরেছে তারা। আর এখন সুযোগ পেয়ে ইচ্ছামত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে তাঁর লোকেদের। কয়েকবার অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো গেল কোনমতে। এই আধা অভুক্ত অবস্থাও করবেটের লোকদের তাঁর প্রতি আনুগত্যে বিন্দু মাত্র চিড় ধরাতে পারেনি। তাদের ধোঁকাবাজি করে কাজ করাচ্ছেন তিনি এ ধরনের যে কোন ইংগিতের প্রতিবাদে লড়াই করতে পর্যন্ত প্রস্তুত তারা। যদিও এ পর্যন্ত নিজেদের রুজি করা একটা কানা-কড়িরও মুখ দেখেনি তারা।

এ বছর বর্ষা আসছে দেরি করে। আকাশের লাল গোলাকার বস্তুটা, সেইসঙ্গে অদৃশ্য কোন চুল্লী থেকে বের হয়ে আসা আগুনের হল্কার মত গরম বাতাস জীবন করে তুলল আরও পীড়াদায়ক। দীর্ঘ, ক্লান্তিদায়ক একটি দিনের শেষভাগে

www.BanglaBook.org

সামারিয়া ঘাট থেকে একটা টেলিগ্রাম পেলেন করবেট। এতে জানানো হয়েছে একটা রেল ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হয়ে, বার্জগুলোতে ওয়াগন নামানো-উঠানো হয় যে পথে তার উপর এসে পড়েছে। এদিকে মোকামেহ্ ঘাটের সমস্ত ওয়াগন পারাপারের কাজ করে এই বার্জগুলোই। অতএব দেরি না করে একটা পঞ্চে চেপে নদীর ওপারে চলে এলেন করবেট। পরবর্তী তিন ঘণ্টায় হ্যাণ্ড জ্যাকের সাহায্যে ইঞ্জিনটাকে দু'বার লাইনে তোলা হলো। কিন্তু তারপরই আবার লাইনচ্যুত হয়ে গেল। বাতাস পড়ে যাওয়ার এবং বালুগুলো রেলের কাঠের স্লীপারের নীচে চাপা পড়বার আগ পর্যন্ত ইঞ্জিনটাকে আবার লাইনে তোলা সম্ভব হলো না। তারপর তৃতীয় প্রচেষ্টায় এটা আর স্থানচ্যুত হলো না এবং নদীর দিকে নেমে যাওয়া পথটা ব্যবহার উপযোগী হলো আবার।

ক্লান্ত এবং বিধ্বস্ত, চোখ দুটো বাতাস আর বালুর আঘাতে লাল আর ফুলে ঢোল হয়ে আছে, এমনি অবস্থায় দিনের প্রথম খানা খেতে বসলেন করবেট। এমন সময় একজনের পেছনে একজন করে তাঁর বারো জন সর্দার প্রবেশ করল কামরায়। কিন্তু যখনই দেখল করবেটের ভৃত্য তাঁর সামনে একটা প্লেট সাজিয়ে রেখেছে, ভারতীয়দের স্বাভাবিক ভদ্রতা বজায় রেখে আবার বের হয়ে গেল কামরা থেকে। আর ডিনার করতে করতে বারান্দার কথাবার্তাগুলো ভেসে আসল তাঁর কানে।

সর্দারদের একজন: সাহেবের সামনে যে প্লেটটা রেখেছ সেটায় কী ছিল?

করবেটের ভৃত্য: একটা চাপাতি আর অল্প একটু ডাল।

একজন সর্দার: শুধু একটা চাপাতি আর একটুখানি ডাল?

ভৃত্য: কারণ এর চেয়ে বেশি কেনার মত টাকা নেই তাঁর কাছে।

একজন সর্দার: আর কী খান তিনি?

ভৃত্য: 'কিছুই না'

খানিক বিরতির পর মেহেদী রাঙ্গা দাড়ির এক বৃদ্ধ মুসলমান সর্দারের কণ্ঠ শুনতে পেলেন, অন্যদের বলছে, 'বাড়ি যাও। সাহেবের সঙ্গে কথা বলবার জন্য অপেক্ষা করব আমি।'

ভৃত্য খালি প্লেটটা সরিয়ে নিতেই কামরায় প্রবেশের অনুমতি চাইল বৃদ্ধ। তারপর তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করল, 'আমরা তোমাকে বলতে এসেছিলাম যে অনেকদিন ধরেই খালি পেটে আছি আমরা। আগামীকালের পর কোনভাবেই আর কাজ করা সম্ভব হবে না আমাদের পক্ষে। কিন্তু আজ দেখলাম তোমার হালও আমাদের চেয়ে কোন অংশেই ভাল না। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যত দিন দাঁড়িয়ে থাকবার ক্ষমতা আছে ততদিন কাজ চালিয়ে যাব। তোমার অনুমতি পেলে এখন চলে যাব আমি। এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তুমি যেন আমাদের সাহায্য করার জন্য কিছু করতে পার।'

www.BanglaBook.org

গত একটা সপ্তাহ ধরে প্রতিদিনই সদরদপ্তরে গোরাখপুরে অর্থ চেয়ে আবেদন করেছেন করবেট। প্রতিটি ক্ষেত্রেই জবাবে জানানো হয়েছে তাঁর বিলটা তাড়াতাড়ি পরিশোধের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

শুশ্রুমণ্ডিত বুড়ো সর্দার চলে যাওয়ার পর সে রাতেই হেঁটে টেলিগ্রাফ অফিসের সামনে চলে আসলেন করবেট। এখান থেকেই প্রতি রাতে দিনকার কাজের রিপোর্ট পাঠান তিনি। আজ টেলিগ্রাফিস্ট-এর সামনে একটা কাগজ রেখে দ্রুত লাইনটা পরিষ্কার করে দিতে বললেন, তিনি একটা জরুরী সংবাদ পাঠাবেন। তখন বারোটার চেয়ে কিছু বেশি বাজে এবং যে সংবাদটা পাঠাবেন পড়তে শুরু করলেন তা, "সকালের ট্রেনে যদি বারো হাজার রুপী পাঠানোর নিশ্চয়তা দেয়া না হয় তবে আজ দুপুর থেকে বন্ধ হয়ে যাবে মোকামেহ ঘাটের সমস্ত কাজ।" টেলিগ্রাফার বার্তাটা পড়ছিল এবং করবেটের দিকে তাকিয়েছিল, বলল, 'যদি অনুমতি দেন তবে এই মুহূর্তে ডিউটিতে থাকা আমার ভাইকে এখনই এটা পাঠিয়ে দিতে বলতে পারি আমি। এতে করে মক্কালে অফিসের সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না।' দশ ঘণ্টা পরে, করবেটের বেঁধে দেয়া সময়সীমা পার হওয়ার দু'ঘণ্টা আগেই, হালকা হলুদ রঙের একটা খাম হাতে একজন সংবাদ বাহককে তাঁর দিকে ছুটে আসতে দেখলেন করবেট। যাদেরই অতিক্রম করে যাচ্ছে সে, কাজ থামিয়ে তার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকছে তারা। মোকামেহ ঘাটের কারোরই গত মধ্য রাতে তাঁর টেলিগ্রাম পাঠানোর কারণ জানতে বাকি নেই। করবেট বার্তাটা পড়া শেষ করতেই সংবাদবাহক, যে তাঁর পিয়নের ছেলে, জানতে চাইল খবরটা শুভ কিনা। যখন বললেন খবর ভাল, চিৎকার করতে করতে ছুটে গেল সে। আর তাঁর চলার পথে ছাউনির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল আনন্দোল্লাস : আগামীকাল সকালের আগে টাকা এসে পৌঁছবে না। কিন্তু মাসের পর মাস ধরে যারা অপেক্ষা করেছে সামান্য কয়েকটা ঘণ্টায় কী আসে যায় তাদের।

পর দিন সকালে কোষাধ্যক্ষ লোকটা হাজির হলো করবেটের অফিসে। তার সঙ্গে বাঁশে ঝুলিয়ে একটা সিন্দুক বয়ে নিয়ে এসেছে করবেটের কিছু লোক। ক্যাশের প্রহরায় আসা দুজন পুলিশও আছে তাদের সঙ্গে : হিন্দু কোষাধ্যক্ষ ভদ্রলোক খুব আমোদপ্রিয়। কপালে লাল টেপ দিয়ে বাঁধা এক জোড়া চশমা ছাড়া তাকে কখনও দেখেননি করবেট। মেঝের উপর নিজেকে স্থির করেই গলায় জড়ানো একটা তার টান দিয়ে খুলে আনল সে, তারপরই শরীরের কোন একটা জায়গা থেকে বের করে আনল একটা চাবি। এবার বাক্সটা খুলে তার থেকে বের করে আনল বারোটা দড়ির থলে, যার প্রতিটিতে আছে আনকোরা নতুন রুপার মুদ্রায় এক হাজার রুপী। একটা ডাকটিকেটে আঠা লাগিয়ে করবেটের স্বাক্ষর করা কাগজটায় সেঁটে দিল তা লোকটা। তারপর বিশাল আকৃতির পকেটে হাত গলিয়ে, যেটার মধ্যে অনায়াসে দুটো খরগোশ ঢুকিয়ে দেয়া যাবে, বের করে আনল নগদ

www.BanglaBook.org

সাড়ে চারশ' রুপী, করবেটের গত তিন মাসের রুজি।

প্রত্যেক সর্দারকে এক হাজার রুপীর এক একটা থলে বুঝিয়ে দেয়ার আগ পর্যন্ত করবেট কল্পনাও করতে পারেননি টাকা দিয়ে কেউ এতটা আনন্দ পেতে পারে। তেমনি ভাবেননি এতটা আনন্দের সঙ্গে মানুষ তাঁর প্রাপ্য অর্থ বুঝে নিতে পারে। মোটকথা এই কেরানির আগমন যেন সত্যিকার অর্থেই বিশাল একটা দুশ্চিন্তার ভার সরিয়ে নিল করবেটের ঘাড় থেকে। আর পুরো ঘটনাটা অনেকটা যেন রূপ নিল একটা উৎসবের। অতএব পর দিন ছুটি ঘোষণা করলেন তিনি। গত ৯৫ দিনের মধ্যে এই প্রথম তিনি কিংবা তাঁর লোকেরা প্রথম ছুটির অস্তিত্ব অনুভব করতে পারলেন। করবেট জানেন না অন্যরা কীভাবে তাদের এই অবসরটা কাটাল। তবে তাঁর বলতে লজ্জা নেই, পুরো সময়টাই তিনি কাটিয়েছেন নিরুপদ্রব ঘুমের মধ্য দিয়ে।

একুশ বছর মোকামেহ ঘাটে মালামাল পরিবহনের কাজ করেন করবেট এবং তাঁর লোকেরা। আর এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে, অর্থাৎ নভেম্বর ১৯১৪-১৮ সাল পর্যন্ত সময় ফ্রান্স এবং ওয়াজিরিস্তানে থাকার সময়টুকু বাদে, আর উত্তর-পশ্চিম ভারতে কোন ধরনের ঝামেলা ছাড়াই নির্বিঘ্নে যাতায়াত করে মানুষ আর মালামাল। তাঁরা যখন কাজটা হাতে নেন তখন মোকামেহ ঘাট হয়ে আসা যাওয়া করত ৫ লাখ টন মালামাল আর যখন এটার দায়িত্ব রাম সারনের হাতে বুঝিয়ে দেন তখন এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক মিলিয়ন টনে।

যেসব মানুষ কেবল আনন্দ আর লাভের জন্য ভারতে আসেন তাঁরা সত্যিকারের ভারতীয়দের সংস্পর্শে আসার কোন সুযোগই পান না। আর ভারতীয়দের আনুগত্য আর একাগ্রতার কারণেই প্রায় দুইশ' বছর এই গোটা ভারতীয় উপমহাদেশ এবং সেই সঙ্গে এ বিশাল জনগোষ্ঠীকে পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে কেবল অল্প কিছুসংখ্যক লোকের পক্ষে। আর আজ যাদের সঙ্গে অর্থাৎ দরিদ্র ভারতীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন তাদের দ্বারা তারা (ইংরেজরা) আসলেই লাভবান হয়েছে নাকি হয়নি তা বিচারের ভার করবেট ছেড়ে দিয়েছেন নিরপেক্ষ ইতিহাসবিদদের হাতে।

---

www.BanglaBook.org

# চামারি

চামারি, নামই বলে দিচ্ছে ভারতের ষাট মিলিয়ন অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিচু জাতের সে। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে একদিন কাজের খোঁজে করবেটের কাছে আসল চামারি। তার মুখে রুক্ষতা আর সেই সঙ্গে বছরের পর বছর সয়ে আসা দারিদ্র্য ও দুঃখ-কষ্টের ছাপ ফুটে আছে প্রকট হয়ে, আর তাদের ছোট বাচ্চা দুটো বলতে গেলে সারাক্ষণই আঁকড়ে ধরে আছে মহিলাটির শতচ্ছিন্ন কামিজের প্রান্ত। চামারি দুর্বল, বেঁটে-খাটো একজন মানুষ আর ছাউনিতে কাজ করার মত শক্তিশালীও সে নয়। অতএব তাকে এবং তার স্ত্রীকে কয়লা আনা-নেয়ার কাজে নিয়োগ করলেন করবেট। পরের দিন সকালে তাদের দুজনের জন্য বেলচা আর ঝুড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি। সাহস, সেই সঙ্গে নিজেদের সামর্থ্যের চেয়ে অনেক বেশি পরিশ্রম দিয়েই কাজ শুরু করল তারা। কিন্তু সন্ধ্যা নাগাদ দেখা গেল তাদের কাজ শেষ করার জন্য অন্য লোক লাগাতে হয়েছে করবেটকে। কারণ ৫০ ওয়াগনের যে কোন একটি র‍্যাকের মালামাল ওঠা-নামায় দেরির অর্থ কয়েক শ' শ্রমিকের কাজ ঝুলে পড়া।

দুই দিন ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে গেল চামারি ও তার স্ত্রী। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী এতে করবেটের উপকার হলো কমই। তৃতীয় দিন সকালে ফোসকা পড়া হাতে ময়লা কাপড় জড়িয়ে কাজে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে, এমন সময় সে লিখতে কিংবা পড়তে পারে কিনা জানতে চাইলেন করবেট। কিছুটা হিন্দী জানা আছে শুনে তার বেলচা আর ঝুড়ি গুদামে জমা দিয়ে, অফিসে তাঁর কামরায় পরবর্তী নির্দেশ নেয়ার জন্য হাজির হতে বললেন। মাত্র কয়েকদিন আগে চড়া মেজাজের কারণে কয়লা শ্রমিকদের দায়িত্বে থাকা সর্দারকে বরখাস্ত করেছেন করবেট। মোকামে ঘাটে কাজ করার পুরো সময়টায় এই একজন লোককেই কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। আর এখন যে কাজটা করছে চামারি আর তার স্ত্রী তাতে কোনমতেই চলছে না তাদের, তাই চামারিকে সর্দার নিয়োগ করে একটা সুযোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন করবেট।

চামারি ধারণা করেছিল তাকে বরখাস্ত করার জন্যই অফিসে ডেকে পাঠিয়েছেন করবেট। কিন্তু এর বদলে একটা নতুন হিসাব বই আর পেন্সিল হাতে ধরিয়ে দিয়ে, যে সব ব্রডগেজ ওয়াগন থেকে কয়লা নামানো হচ্ছে সেগুলোর নাম্বার এবং প্রতিটি ওয়াগনে নারী-পুরুষ যারা কাজ করছে তাদের নামের একটা তালিকা তৈরি করতে বললেন করবেট তাকে। আর এতে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল

www.BanglaBook.org

সে : একই সঙ্গে গর্বও অনুভব করল। আধ ঘণ্টা পর যে সব তথ্য জানতে চেয়েছেন করবেট সেগুলো পরিষ্কারভাবে খাতায় টুকে হাজির হলো সে। তথ্যগুলো মিলানোর পর খাতাটা তার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে করবেট জানালেন কয়লা দলের সর্দার হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাকে। ওইসময় ২০০ নারী-পুরুষ কাজ করছিল এই দলে : এবার তার দায়িত্ব তাকে বুঝিয়ে দিলেন করবেট। একজন অপদস্থ মানুষ কেবল এক ঘণ্টা আগেও যে তার দলিত সম্প্রদায়ে জন্মের সমস্ত অযোগ্যতা নিয়ে হতাশ মনে কাজ করে চলেছিল, এখন করবেটের কামরায় যখন হাজির হলো তখন তার বগলের নীচে গোঁজা একটি বই আর কানের পিছনে আটকানো একটি পেন্সিল। আর জীবনে এই প্রথমবারের মত মাথা উঁচু করে হাঁটতে শিখল সে।

করবেট সারা জীবনে যত লোককে কাজে নিয়োগ দিয়েছেন তার মধ্যে চামারিই সবচেয়ে পরিশ্রমী এবং সৎ। যে দলটার সর্দার নির্বাচিত হয় সে তাতে ছিল ব্রাহ্মণ, চ্যাটার্জি, ঠাকুর সহ নানা জাতের মানুষ। আর জন্মসূত্রে উঁচু জাতের লোক হিসাবে পরিচয় পেয়ে আসা এসব লোকের প্রতি একবারের জন্যও অশ্রদ্ধা দেখায়নি সে। তার অধীনে যেসব লোক কাজ করত তাদের সকলের আলাদা হিসাব রাখার দায়িত্বও ছিল চামারির। এবং করবেটের অধীনে যে দীর্ঘ ২০ বছর কাজ করেছে সে এর মধ্যে একবারও তার হিসাবে কোন গরমিলের অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

রবিবার সন্ধ্যায় করবেট এবং চামারি হিসাব নিয়ে বসতেন। চামারি বসত একটা মাদুরের উপর আর করবেট টুলের উপর। তাদের মাঝখানে স্তূপ করে রাখা থাকত তামার মুদ্রা। আর তাদের ঘিরে সপ্তাহের মজুরি নেয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত নারী আর পুরুষেরা। তাঁকে ঘিরে বসে থাকা এই সাধারণ পরিশ্রমী মানুষগুলোর মত রবিবার সন্ধ্যাটা দারুণ উপভোগ করতেন করবেট নিজেও। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাদের উপার্জন করা এই অর্থ লোকগুলোকে বুঝিয়ে দিতে পারাতেই ছিল তাঁর আনন্দ। পুরো সপ্তাহ জুড়ে তারা কাজ করত আধ মাইল দীর্ঘ একটা ছাউনির মধ্যে; এদের কেউ কেউ থাকত তাদের জন্য করবেটের তৈরি করে দেয়া কোয়ার্টারে। অন্যরা থাকত চারপাশের গ্রামগুলোয়। ফলে সামাজিক মেলামেশার খুব একটা সুযোগ এসময় তাদের ছিল না। রবিবার সন্ধ্যা তাদের সেই সুযোগটা দিত এবং এর পুরোমাত্রায় সদ্ব্যবহার করত লোকগুলো; যে সব মানুষদের প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয় তারা সবসময়ই আনন্দ-উল্লাসের মধ্যে থাকে; কাল্পনিক বিভিন্ন সমস্যা তৈরির মত অলস সময় তাদের নেই। আর কে না জানে এ ধরনের কাল্পনিক সমস্যা সত্যিকারের সমস্যা থেকে অনেক জটিল। করবেটের এই লোকগুলো নিঃসন্দেহে একেবারেই দরিদ্র এবং তাদের সমস্যারও শেষ নেই। কিন্তু এর পরেও তারা আনন্দ ও উল্লাসের মধ্যে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাটানোর চেষ্টা করত তাদের সময়। করবেট যখন এসব নারী-পুরুষের ভাষা তাদেরই মত বলতে এবং বুঝতে শিখে গেলেন তখন এদের তরল হাসি-ঠাট্টাগুলোয় অংশ নিতে পারলেন নিজেও. সেই সঙ্গে তাদের সমস্ত কৌতুকও সমানতালে উপভোগ করে যেতে পারলেন।

রেলওয়ে করবেটকে অর্থ দিত ওজন অনুসারে। আর করবেটও ছাউনি এবং কয়লার প্ল্যাটফর্মে কাজ করা উভয় দলের শ্রমিকদেরই মজুরি দিতেন ওয়াগন হিসাবে। ছাউনির বেলায় সর্দারকে মজুরি বুঝিয়ে দিতেন তিনি, যা প্রাপ্য অনুসারে প্রত্যেক শ্রমিককে বুঝিয়ে দিত সে। কিন্তু যে-সমস্ত মানুষ কয়লার কাজ করত তাদের মজুরি বুঝিয়ে দিতেন করবেট নিজেই. তিনি চামারিকে যে টাকা দিতেন তা মোকামে খাজার থেকে পয়সায় ভাঙিয়ে নিয়ে আসত সে। রবিবার সন্ধ্যায় সেই পয়সার স্তূপ মাঝখানে নিয়ে বসতেন দু'জনে। তারপর পুরো হপ্তায় আলাদা আলাদা ভাবে প্রতিটি ওয়াগনের মাল খালাসের সঙ্গে জড়িত নারী-পুরুষদের নাম ঘোষণা করত চামারি। এসময় মনে মনে দ্রুত একটা হিসাব কষে নিয়ে প্রত্যেক শ্রমিককে তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতেন করবেট। প্রতিটি ওয়াগনের মাল খালাসের জন্য তিনি দিতেন ৪০ পয়সা (দশ আনা)। যখন নির্দিষ্ট কোন ওয়াগনের মাল খালাসের সঙ্গে জড়িতদের মধ্যে ঠিক সমান হারে পয়সা ভাগ করে দেয়া যেত না তখন শ্রমিকদের একজনকে বাড়তি পয়সা দিয়ে দিতেন করবেট। পরে এই পয়সা দিয়ে লবণ কিনে সবার মধ্যে ভাগ করে দেয়া হত। আর মজুরির এই পদ্ধতি তাদের সবাইকেই সন্তুষ্ট করত। যেহেতু কাজটা অনেক পরিশ্রমের এবং দীর্ঘ সময় ধরে করতে হত তাই জমিতে কাজ করে যে রোজগার হত এভাবে এর তিনগুণ আয় হত তাদের। তা ছাড়া করবেটের কাজটা ছিল স্থায়ী, আর ফসলের কাজ ঋতুভিত্তিক ও অস্থায়ী।

শুরুতে চামারির মাসিক বেতন ছিল ১৫ রুপী। এক সময় বাড়তে বাড়তে তার এই মাসিক মজুরি গিয়ে ঠেকে ৪০ রুপিতে। এটা রেলওয়েতে কাজ করা অধিকাংশ কেরানির মজুরির চেয়ে বেশি। এর পাশাপাশি ছাউনিতে কাজ করা দশজন লোককে পরিচালনার অনুমতিও তাকে দিলেন করবেট। ভারতে একজন লোকের মূল্যায়ন করা হয় সে কেমন রোজগার করছে তা এবং এই অর্থ কী কাজে লাগাচ্ছে তার উপর। এদিকে বেশ ভাল আয়ের জন্য ইতিমধ্যে গোটা এলাকায় বেশ ভাল সম্মান পেতে শুরু করল চামারি, তবে এর চেয়েও বেশি সম্মান পেল তার কামাইকে ঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য। ক্ষুধা কী জিনিস তা জানা থাকায় যে যন্ত্রণা নিজে ভোগ করেছে তা যেন আর কারও ভোগ করতে না হয় তা দেখা নিজের দায়িত্ব মনে করেছে সে। তার দরজার সামনে দিয়ে যাওয়া তার মত নিচু সম্প্রদায়ের প্রতিটি মানুষকে খাওয়ার জন্য নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানায় চামারি। আর সে সমস্ত লোক, যাদের জাত তার স্ত্রীর রান্না করা খাবার

www.BanglaBook.org

খাওয়ার অনুমোদন দেয় না, তাদের বাড়িতে খাবার রান্না করার জন্য সদাই-পাতিই দিয়ে দেয় চামারি। একদিন চামারির স্ত্রীর অনুরোধে, তার এভাবে অন্যদের মাঝে ইচ্ছামত বিলিয়ে বেড়ানোর বিষয়টা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন করবেট। জবাবে সে জানাল, যখন করবেট তাকে কাজে নিয়োগ দেন তখন তার আয় ছিল ১৫ রুপী, যাতে তাদের প্রয়োজন মিটে যেত ভালভাবেই; আর এখন এই অতিরিক্ত অর্থ সমাগম তার স্ত্রীকে বিলাসী হতে উৎসাহিত করছে। করবেট এবার জিজ্ঞেস করলেন কেমন ধরনের বিলাসিতা দেখাচ্ছে সে, তখন চামারি জানাল তার স্ত্রী সবসময়ই তার পোশাক-আশাক নিয়ে তর্ক করে, বলে যে সমস্ত লোক চামারির অধীনে কাজ করছে তাদের চেয়ে তার ভাল কাপড় পরা উচিত; যেখানে কাপড়ের পিছনে পয়সা খরচের চেয়ে দরিদ্রদের খাওয়াবার পিছনে খরচটাকেই উপযুক্ত মনে করে চামারি। তারপরই নিজের উত্তরের সপক্ষে যুক্তি খাড়া করে বলল, 'নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ, মহারাজ।'—প্রথম দিন থেকেই এই নামে করবেটকে সে ডেকে আসছে এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ব্যত্যয় হয়নি এর—'কয়েক বছর ধরে এই একটা স্যুটই পরছ তুমি। আর তুমি যদি এটা করতে পারো, তবে আমি কেন পারব না?' তবে প্রকৃতপক্ষে স্যুটের বিষয়ে চামারির অনুমান ছিল ভুল। কারণ ঠিক একই রকম দুটো স্যুট ছিল করবেটের; কয়লার ধুলায় ময়লা হয়ে যাওয়াটা ধুতে দিয়ে অপর স্যুটটা গায়ে চাপাতেন করবেট।

মোকামে ঘাটে করবেট ১৬ বছর পার করে দেয়ার পর কাইজার উইলহেম শুরু করেন তার যুদ্ধ। আর এই যুদ্ধে যোগ দেয়া মনস্থ করলেন তিনি। রেলওয়ে শুরুতে করবেটের যুদ্ধে যোগদানের বিরোধিতা করলেও তিনি যখন তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন তখন আর আপত্তি করল না। যে সভায় তাঁর লোকেদের ডাকেন করবেট তাতে তাদেরকে যুদ্ধে তাঁর জড়িয়ে পড়ার বিষয়টি পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা ছিল প্রায় অসম্ভব। যা হোক তাদের প্রত্যেকেই তাঁর অনুপস্থিতিতে কাজ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে মত দিল। আর কেবল তাদের আনুগত্য আর একাগ্রতার কারণেই যে কয়েক বছর করবেট ছিলেন না মোকামে ঘাটের মাল-সামান আনা-নেয়ায় কোন ধরনের ত্রুটি লাগল না কিংবা জটিলতা সৃষ্টি হলো না। করবেট প্রথমে দায়িত্ব পালন করলেন ফ্রান্সে তারপর ওয়াজিরিস্তানে। তাঁর অবর্তমানে ট্রান্সশিপমেন্ট পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করল রামসারান। চার বছর পর ফিরে এসে করবেট যখন তাঁর লোকদের সঙ্গে আবার কাজ শুরু করলেন তখন তাঁর মনে এমন অনুভূতি হলো যে কেবল এক দিনের জন্য তাদের ছেড়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর ফিরে আসা তারা উদযাপন করল মন্দির, মসজিদ আর বাড়িতে প্রার্থনা করে।

যুদ্ধ শেষে করবেট ভারতে ফিরে আসেন যে বছর, তার পরের গ্রীষ্মে বাংলায় ছড়িয়ে পড়ল কলেরার মহামারী। এক সময় কয়লা শ্রমিকদের মধ্য থেকে দুইজন

www.BanglaBook.org

মহিলা আর একজন পুরুষ আক্রান্ত হলো এতে। পালাক্রমে অসুস্থদের সেবা করলেন করবেট আর চামারি, তাদের আত্মবিশ্বাস যুগিয়ে গেলেন, একসময় কেবল প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির জোরেই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠল মানুষগুলো। তারপরই এক রাতে তাঁর বাংলোর বারান্দায় কারও পদশব্দ শুনলেন করবেট—স্টোরার পদোন্নতি পেয়ে চলে যাওয়ায় করবেট এখন নিজের করে একটি বাংলো পেয়েছেন—করবেট পরিচয় জানতে চাইলে অন্ধকারের মধ্য থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এল, 'আমি চামারির স্ত্রী। আমি আপনাকে জানাতে এসেছি যে চামারির কলেরা হয়েছে।' মহিলাটিকে অপেক্ষা করতে বলে দ্রুত পোশাক পরে, লণ্ঠনটা ধরিয়ে নিলেন করবেট। তারপর একটা লাঠি হাতে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন। লাঠি নেয়ার কারণ বিষধর সাপেদের রীতিমত এক আড্ডাখানা ছিল এই মোকামে ঘাট।

সারাদিন কাজ করার পর সেদিন বিকালে করবেটের সঙ্গে কাছের এক গ্রামে আসে চামারি। সেখানে পার্বতী নামে চামারির দলের এক নারী মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে বলে খবর পেয়েছিলেন তাঁরা। তিন সন্তানের জননী এই বিধবা রমণীই প্রথম নারী যে কিনা করবেট মোকামে ঘাটে আসার পর তাঁকে কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল। আর গত বিশ বছর অক্লান্তভাবে কাজ করে গেছে সে। সবসময়ই হাসি-খুশি থাকত পার্বতী, যখনই যার সাহায্য প্রয়োজন তা দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেনি। রবিবার সন্ধ্যার জমায়েতের সেই ছিল মধ্যমণি। কারণ একজন বিধবা হওয়ায় ভারতীয় সমাজে নারীদের কঠোর বিধি-নিষেধ এড়িয়ে যা ইচ্ছা তাই বলার সুযোগ ছিল তার। যে ছেলেটা করবেটের কাছে খবরটা বহন করে নিয়ে এসেছিল সে জানে না মহিলাটির আসলে কী হয়েছে, তবে আস্তে আস্তে যে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে পার্বতী তা ঠিকই বুঝতে পেরেছে। কাজেই সঙ্গে অল্প কিছু ওষুধ নিয়ে এবং পথে চামারিকে ডেকে নিয়ে দ্রুত গ্রামটার দিকে রওয়ানা হলেন। সেখানে পৌঁছে বৃদ্ধ মার কোলে মাথা দিয়ে তার কুঁড়েতে শুয়ে থাকতে দেখলেন তারা পার্বতীকে। এই প্রথম ধনুষ্টংকারের কোনও রোগী দেখলেন করবেট, সেই সঙ্গে প্রার্থনা করলেন জীবনে যেন আর দেখতে না হয়। পার্বতীর সাদা ঝকঝকে দাঁতগুলো, যেগুলো কিনা চলচ্চিত্রের যে-কোন নায়িকার স্বপ্ন হতে পারত, পানি খাওয়ানোর জন্য জোর করে খুলতে গিয়ে ভেঙে গেছে। জ্ঞান থাকলেও কোন কথা বলতে পারছে না সে। আর সে যে যন্ত্রণা ভোগ করছে কলমের কালিতে তা বর্ণনা করার মত কোন ভাষা জানা নেই করবেটের। সে যেন একটু সহজে শ্বাস নিতে পারে তাই তার শক্ত হয়ে আসা গলার পেশিগুলো মালিশ করে দেয়া ছাড়া এই মরণযন্ত্রণা থেকে তাকে মুক্তি দেয়ার মত কিছুই করতে পারলেন না করবেট। আর তিনি যখন এই কাজটা করছেন তখন মহিলাটার শরীর এভাবে খিঁচুনি দিচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন বিদ্যুতের

www.BanglaBook.org

শক দেয়া হচ্ছে তাকে। সৌভাগ্যের বিষয় একসময় ক্ষীণ হতে হতে থেমে গেল তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, সেই সঙ্গে পার্বতী রেহাই পেল এই নরক যন্ত্রণা থেকে। বাড়ির বেদনাবিধুর পরিবেশ থেকে যখন বিদায় নিচ্ছেন তখন তাদের মধ্যে বিনিময় করার মত কোন ভাষা নেই। ইতিমধ্যে সেখানে শুরু হয়ে গেছে শবদাহের প্রস্তুতি। উচ্চবর্ণের একজন মহিলার সঙ্গে তার এই শেষকৃত্যের আকাশ-পাতাল তফাত, কিন্তু তাতে তার প্রতি করবেটদের আকর্ষণের কোন হেরফের হলো না। মুখে স্বীকার না করলেও দু'জনেই জানেন এই প্রাণবন্ত, পরিশ্রমী মহিলাটিকে খুব মনে পড়বে তাদের। সেদিন সন্ধ্যায় চামারির সঙ্গে আর করবেটের দেখা হয়নি, কারণ একটা কাজে সামারিয়া ঘাটে চলে যেতে হয় তাকে। আর এখন তার স্ত্রী এসে করবেটকে জানাল সে কলেরায় আক্রান্ত হয়েছে

ভারতীয়রা (করবেট নিজেও) কলেরাকে প্রচণ্ড অপছন্দ সেই সঙ্গে ভয় করে। তবে এটা নিজের দেহে ছড়িয়ে পড়বে এই আতঙ্ক পেয়ে বসে না তাদের। কারণ সম্ভবত ভাগ্যে যা নির্ধারিত হয়ে আছে শত চেষ্টা করলেও তা তো আর ঠেকানো যাবে না, মনের এই বিশ্বাস কাজেই চামারির দড়ির বিছানার পাশে মেঝেতে কয়েক জন লোককে শুয়ে থাকতে দেখে মোটেই অবাক হলেন না করবেট। অন্ধকার হয়ে আছে কামরাটা, কিন্তু করবেটের হাতের লণ্ঠনের মৃদু আলোয় তাকে ঠিকই চিনতে পারল চামারি। বলল, 'এই সময় তোমাকে ডেকে আনার জন্য মেয়েলোকটাকে মাফ করে দেবে—ঘড়িতে তখন রাত দুইটা—'সকাল না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে বিরক্ত না করার নির্দেশ দিয়েছিলাম আমি তাকে। কিন্তু আমার কথা শোনেনি সে।' মাত্র দশ ঘন্টা আগে করবেটকে ছেড়ে গিয়েছিল চামারি, এবং গিয়েছিল চমৎকার সুস্থ অবস্থায়। কিন্তু এই অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তার চেহারার পরিবর্তন দেখে হতভম্ব হয়ে পড়লেন তিনি। সবসময়ই বেঁটে, রোগা-পাতলা গড়নের মানুষ সে, কিন্তু এখন কী এক ভোজবাজিতে যেন তার অঙ্গের ওই আকারেরই অর্ধেক হয়ে গেছে। চোখগুলো গর্তে ঢুকে পড়েছে; তার কণ্ঠ দুর্বল, কেবল ফিসফিস থেকে একটু জোরে শোনা যাচ্ছে। ঘরটা বেশ উত্তপ্ত। কাজেই তার অর্ধ নগ্ন দেহটা একটু কাপড় দিয়ে ঢেকে দিয়ে লোকগুলোকে দিয়ে বাইরের খোলা উঠানে নিয়ে আসলেন বিছানাটা। একজন কলেরা আক্রান্ত মানুষের জন্য জায়গাটা রীতিমত জনকোলাহলে পূর্ণ, কিন্তু একটা উত্তপ্ত কামরা যেখানে একজন মানুষ শ্বাস নেয়ার জন্য পর্যাপ্ত বাতাস পাচ্ছে না তার চেয়ে অন্তত ভাল। করবেট এবং চামারি এক সঙ্গে কলেরার অনেকগুলো ঘটনা সামলেছেন এর আগে। কাজেই চামারির চেয়ে ভাল করে আর কেউই জানে না আতঙ্কিত হয়ে পড়ার বিপদ এবং করবেটের নির্দেশে সাধারণ ওষুধে ভাল হয়ে উঠবে এমন বিশ্বাস মনে আঁকড়ে রাখা এক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আর সত্যি সত্যি বীরের মত এই ভয়াবহ রোগটার বিরুদ্ধে লড়ল সে। কখনোই আশা ছাড়ল না, কলেরা মোকাবেলায় যা

www.BanglaBook.org

তাকে খেতে বললেন করবেট তাই মেনে নিল বিনা দ্বিধায়। এবং ধরে রাখল নিজের শক্তি। এমনিতে চারদিক বেশ উত্তপ্ত হলেও তার ভিতরটা শীতল। আর তার শরীরকে উত্তপ্ত রাখার কেবল একটা উপায়ই জানা আছে করবেটের, আর সে মত একটা পাত্রে জ্বলন্ত অঙ্গার ঠেসে পুরে তার বিছানার তলায় রেখে দিলেন। সেই সঙ্গে সাহায্যকারীদের বললেন তার ঠাণ্ডা হয়ে আসা হাতের তালু এবং পায়ের পাতায় ক্রমাগত আদার গুঁড়ো ডলতে। প্রায় ৪৮ ঘণ্টা ধরে চলল এই যুদ্ধ। প্রতিটা মুহূর্তেই চলল যমে-মানুষে দড়ি টানাটানি। তারপরই ছোট্ট কিন্তু প্রচণ্ড সাহসী মানুষটি জ্ঞান হারাল। তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ক্ষীণ হয়ে আসতে শুরু করল, শ্বাস-প্রশ্বাসও স্তিমিত হয়ে এল। মধ্য রাত থেকে ভোর সাড়টার কিছুটা পর পর্যন্ত তার অবস্থার কোনও পরিবর্তন হলো না। তাঁর বন্ধু যে আর কখনোই সুস্থ হয়ে উঠবে না তা এখন স্পষ্ট উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন করবেট। এতক্ষণ ধরে করবেটকে সঙ্গ দিয়ে আসা লোকগুলোর কেউ ওই মুহূর্তে বসে ছিল, কেউ গোল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ঠিক এমনই সময় চামারি হঠাৎ করেই উঠে বসল। তারপরই স্বাভাবিক কিন্তু উৎকণ্ঠা কণ্ঠে আর্তি করল, 'মহারাজ, মহারাজ! তুমি কোথায়?' তার বিছানার মাথায় দাঁড়িয়ে ছিলেন করবেট, যখন এগিয়ে এসে তার হাত চামারির কাঁধে রাখলেন, দুই হাত দিয়ে হাতটা জড়িয়ে ধরে সে বলে উঠল, 'মহারাজ, পরমেশ্বর আমাকে ডাকছেন। আমি অবশ্যই যাব।' তারপর দুটো হাত এক করে মাথা নিচু করে বলল, 'পরমেশ্বর, আমি আসছি।' তাকে যখন আবার বিছানায় শুইয়ে দিলেন করবেট ততক্ষণে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছে সে।

আনুমানিক প্রায় শ'খানেক লোক এসময় উপস্থিত ছিল এবং তার শেষ কথাগুলো শুনেছে তাদের সবাই। এদের মধ্যে কপালে পদমর্যাদার বিশেষ চন্দন চিহ্ন দেয়া একজন আগন্তুকও ছিলেন। করবেট যখন তার নিষ্প্রাণ দেহটা বিছানায় শুইয়ে দিচ্ছেন তখন মৃত লোকটির পরিচয় জানতে চাইলেন। যখন জানানো হলো এটা চামারি তখন বললেন, 'অনেকদিন ধরে যাকে খুঁজেছিলাম শেষ পর্যন্ত তার সন্ধান পেয়েছি আমি। আমি কাশির পবিত্র বিষ্ণু মন্দিরের একজন পুরোহিত। আমার প্রভু, প্রধান পুরোহিত এই লোকটির ভাল কাজের কথা শুনে তাকে খুঁজে বের করে মন্দিরে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন আমাকে। এখন আমি আমার প্রভুর কাছে ফিরে যাব এবং তাঁকে জানাব চামারি মারা গেছে। চামারিকে যে কথাগুলো বলতে শুনেছি তাও তাঁকে জানাব আমি।' তারপরই তার বোঝাটা মাটিতে নামিয়ে রেখে, জুতা জোড়া খুলে হেঁটে চামারির বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন তিনি। পরমুহূর্তেই মৃত দলিত শ্রেণীর লোকটার শরীরে মাথা ঠেকিয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত।

মোকামে ঘাটে চামারির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মত এমনটি আর কখনও হয়নি। কারণ উঁচু-নিচু, ধনী-গরীব, হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান-দলিত সব ধরনের লোকই

www.BanglaBook.org

শ্রদ্ধা জানাতে আসে তাকে। তারা শ্রদ্ধা জানায় এমন একজন মানুষকে যে কিনা এসেছিল বন্ধুহীন এবং তার সমস্ত অযোগ্যতায় মর্মাহত হয়ে, কিন্তু ফিরে গেল সবার শ্রদ্ধা আর অনেকেরই ভালবাসা নিয়ে।

খ্রিস্টান বিশ্বাস অনুসারে চামারি একজন অধার্মিক মানুষ আর হিন্দু দলিতদের মধ্যে সবচেয়ে নিচু জাতের। কিন্তু সে যেখানে গেছে তাঁকেও যদি সেখানে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হয় তবে বিনা দ্বিধাতেই তার সঙ্গী হতে রাজি আছেন করবেট।

---

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মোতি হালকা-পাতলা, সুন্দর স্বাস্থ্যের দেহ তার। ভারতের যে-কোন উচ্চ বর্ণের লোকের সব বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে ছিল। গোটা পরিবারের দায়িত্ব তার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে মোতির বাবা এবং মা যখন গত হলেন তখন সে বয়সে একেবারেই যুবা। সৌভাগ্যক্রমে মোতির পরিবারটি ছিল খুবই ছোট, সে ছাড়া আর ছিল তার ছোট ভাই ও বোন।

এসময় মোতির বয়স চোদ্দ। ছয় বছর হলো বিয়ে হয়েছে তার। অপ্রত্যাশিতভাবে পরিবারের কর্তা হিসাবে নিজেকে আবিষ্কার করার পর তার প্রথম কাজগুলোর একটি হলো, বারো বছরের স্ত্রীকে বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে আসা। স্ত্রীকে বিয়ের পর একবারও দেখেনি, জায়গাটা কালাধুঙ্গি থেকে বারো মাইল দূরে।

উত্তরাধিকার সূত্রে যে ছয় একর ফসলি জমি মোতি পেয়েছে, তা সামলানোর জন্য তার মত অন্তত গোটা চারেক তরুণের প্রয়োজন। অতএব একজন অংশীদার নিল সে। স্থানীয়ভাবে একে বলে সাগি। দিনে আর রাতে জমিতে কাজ করবার বিনিময়ে খাওয়া-দাওয়া ছাড়াও উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক পাবে সে।

গ্রামের সাধারণ মানুষ যে ঘরগুলোয় থাকে সেগুলো তৈরি বাঁশ আর ঘাস দিয়ে। পারমিট করে জঙ্গল থেকে দীর্ঘ পথ কাঁধে বা মাথায় বয়ে সেগুলো আনতে হয়। পর্বতের ঢালে বয়ে যাওয়া ঝোড়ো বাতাসের কারণে এসব বাড়ি নিয়মিত সংস্কার করতে হয়। মোতি আর তার অংশীদারের জন্য এ কাজ গোদের উপর বিষ ফোঁড়া হয়ে দেখা দেয়। আর তাদের এই কষ্ট লাঘবের জন্য একটা পাথরের বাড়ি তৈরি করে দিলেন করবেট। প্রায় চার ফুট ভিত্তির উপর তৈরি করা বাড়িটায় তিনটা কামরা আর একটা প্রশস্ত বারান্দা।

শস্য রক্ষা করার জন্য করবেটের জায়গায় গ্রামটি পড়ে ওঠে বলে এর নাম করবেটদো। জংলি কাঁটার বেড়া দিয়ে গোটা গ্রামটা ঘিরে দেয় গ্রামবাসীরা। এটা গ্রামবাসীদের কয়েক সপ্তাহের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল। এই পলকা বেড়া পোষা গবাদি পশু কিংবা বুনো জন্তুদের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সফল কমই হয়। যখন ফসল আসে তখন গ্রামের লোকদের রাত ভর জমির দিকে নজর রাখতে হয়। আগ্নেয়াস্ত্রের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। করবেটদের গ্রামের চল্লিশ ঘর প্রজার জন্য সরকার অনুমোদন দিয়েছে কেবল একটি এক নলের গাদা বন্দুক। এই বন্দুক পালাক্রমে গ্রামবাসীদের হাতে দেয়া হয়। সে ফসল রক্ষা করার সুযোগ পায়। অন্য পরিবারগুলো এসময় নির্ভর করে টিনের ক্যানেস্তারার উপর। সারারাত ভর

www.BanglaBook.org

ক্যানেস্তারা পিটিয়ে শব্দ করে শস্যলোভী বন্যপ্রাণীদের ঠেকানোর চেষ্টা করে তারা : ফসলের সবচেয়ে বড় শত্রু শুয়োর আর সজারু। বন্দুকটা ব্যবহার করে শুয়োর বা সজারুকে ঠেকিয়ে রাখা গেলে ফসল একটু রক্ষা পায়। ওই ফসল দরিদ্র গ্রামবাসীদের বিবেচনায় মোটেই নগণ্য নয়।

গ্রামের বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে ছাড়া ছাড়া ভাবে। গোটা গ্রামটি ঘিরে আছে জঙ্গল। মোকাম ঘাটে তাঁর মাল তদারকিতে যখন লাভ আসতে শুরু করল, গ্রামের চারধারে পাথরের একটা দেয়াল নির্মাণ শুরু করালেন করবেট। দেয়াল তৈরি যখন শেষ হলো তখন এটির উচ্চতা দাঁড়াল ছয় ফুট আর দৈর্ঘ্য তিন মাইল। গোটা দেয়ালটা তৈরি করতে সময় লেগে যায় প্রায় দশ বছর, কারণ মোকাম ঘাটে করবেটের লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল নিতান্তই অল্প। আপনাকে এখনও গাড়িতে করে হালদুয়ানি থেকে কালাধুঙ্গি হয়ে রামনগরে যেতে হলে বোর সেতু পার হয়ে জঙ্গলে ঢোকার মুখে এই দেয়াল অতিক্রম করতে হবে।

ডিসেম্বরের এক শীতের সকালে গ্রামের মধ্য দিয়ে এগুচ্ছিলেন করবেট। একটার পর একটা ধূসর তিতিরের বাচ্চার ঝাঁককে তাড়াতে তাড়াতে সামনে সামনে দৌড়াচ্ছে তাঁর পোষা কুকুর রবিন। সে ছাড়া আর কেউ এই পাখিদের বিরক্ত করে না। সকালে সূর্যোদয় আর সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের সময় গ্রামের সব লোক এদের ডাক শুনতে পছন্দ করে। এমনিতেই একটা সেচের নালার কিনারে শুয়োরের পায়ের ছাপ চোখে পড়ল করবেটের। বিশাল বাঁকানো দাঁতের এই শুয়োরটা আকারে একটা মোষের বাচ্চার সমান। গ্রামের সব লোকই একে চেনে। কাঁটা-তারের বেড়া পার হয়ে খেতে ঢুকে পড়ে ইচ্ছামত খেয়ে দিনকে দিন আরও মোটাসোটা হয়ে উঠছে ওটা। শুরুর দিকে দেয়ালটা কিছুটা দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল তাকে। কিন্তু প্রচণ্ড একগুঁয়ে প্রাণীটা এক পর্যায়ে দেয়ালের উপর চড়তে শিখে যায়। বিভিন্ন সময় ফসল পাহারার শুয়োরটাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছে। কয়েকবার রক্তের চিহ্নও রেখে যেতে হয়েছে তাকে; কিন্তু জীবন সংশয় ঘটানোর মত ছিল না। উল্টো লাভ বলতে, এখন আরও সতর্ক হয়ে উঠেছে সে।

আর ডিসেম্বরের এই সকালে শুয়োরটার পায়ের ছাপ করবেটকে টেনে নিয়ে চলল মোতির বাড়ির দিকে। বাড়ির কাছে পৌঁছে মোতির স্ত্রীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। কোমরে হাত দিয়ে শুয়োরটা তাদের আলুর ক্ষেতের কতটা ক্ষতি করেছে তা পর্যবেক্ষণ করছে মেয়েটা।

প্রাণীটা তার কাজ বেশ ভাল মতই শেষ করেছে। আলুগুলো তখনও পুরোপুরি পরিপক্ব হয়নি। শুয়োরটা ছিল প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত। রবিন যখন খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বজ্জাত প্রাণীটা কোন্ দিকে গেছে তা খুঁজে বের করছে, মেয়েটা তখন তার অনুভূতি প্রকাশ করল এর পুরোটাই হয়েছে পুনার বাবার কারণে। গত রাতে বন্দুক হাতে পাহারার পালা ছিল তার। ফসল পাহারা দেয়ার বদলে সে ওৎ পেতে বসে ছিল কালুর গম ক্ষেতে। ভেবেছিল ওখানে রাতে সম্বর শিকারের সুযোগ

www.BanglaBook.org

মিলবে। সে যখন বাইরে ছিল তখনই শয়তানটা তার কাজ করে গেছে।'

ভারতের এই অংশে কোনও মহিলা তার স্বামীর নাম ধরে ডাকে না, পরিচয় করিয়ে দেয় না। সন্তান জন্মের আগে তার পরিচয় বাড়ির কর্তা আর সন্তান জন্মের পর তাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় প্রথম সন্তানটির বাবা হিসাবে। মোতি এখন তিন সন্তানের বাবা, তার এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো পুনা। কাজেই তার স্ত্রীর কাছে সে পুনার বাবা আর গ্রামের সকলের কাছে তার স্ত্রী হচ্ছে পুনার মা।

পুনার মা শুধু যে করবেটদের গ্রামের সবচেয়ে পরিশ্রমী মহিলা তা-ই নয়, তার জিহবাও ভয়ানক ধারালো। সুতরাং গত রাতে এখানে অনুপস্থিত থাকার জন্য পুনার বাবা সম্পর্কে তার ধারণা করবেটের সামনে প্রকাশিত ভাষাতেই প্রকাশ করল সে। তারপর করবেটের দিকে ফিরে বলতে শুরু করল, যে দেয়ালের উপর একটা শুয়োর উঠে যেতে পারে এমন একটা দেয়াল তৈরি করে করবেট কেবল তার অর্থই অপচয় করেছেন; আর এখন তিনি যদি শুয়োরটাকে গুলি করে না মারেন, তা হলে তার উচিত হবে দেয়ালটা আরও কয়েক ফুট উঁচু করে দেয়া। কোনও শুয়োর যেন ওটার উপর চড়ে বসতে না পারে। করবেটের সৌভাগ্য এই ঝড় যখন তাঁর উপর বয়ে যাচ্ছে তখন মোতি এসে উপস্থিত হলো। তাকেই মোকাবেলা করতে দিয়ে রবিনকে পিছ দিয়ে ডেকে কিছুটা অস্বস্তি নিয়ে উল্টো পথে রওয়ানা হলেন করবেট।

সন্ধ্যায় দেয়ালের দূরবর্তী প্রান্তে শুয়োরটার পায়ের ছাপ খুঁজে পেলেন তিনি। কখনও বনাঞ্চলী চলাচলের পথ ধরে আবার কখনও বোর নদীর তীর ঘেঁসে মাইল দুয়েক অনুসরণ করলেন। তারপর ওটা তাকে নিয়ে এল প্যাটেনা কাঁটাঝোপের সামনে। যেহেতু এই ঝোপের মধ্যে শুয়োরটা থাকার পঞ্চাশ ভাগ সম্ভাবনা আছে এবং গুলি করার জন্য এখনও পর্যাপ্ত আলো আছে, তাই ঝোপের কিনারে অবস্থান নিলেন করবেট।

নদীর তীরে একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ার একটু পরেই জঙ্গলের উপরের প্রান্ত থেকে একটা মাদী সম্বর ডাকতে শুরু করল। কয়েক বছর আগে এই জঙ্গলেই পাওয়াল গড়ের কুমার বাহাদুরকে গুলি করেছিলেন করবেট। জঙ্গলের বাসিন্দাদের একটা বাঘের উপস্থিতি বিষয়ে সতর্ক করে দিচ্ছে প্রাণীটা। দুই সপ্তাহ আগে একটা বাঘ মারার জন্য তিনজন বন্দুকধারী কালাধুঙ্গি এসে পৌঁছেছে, সঙ্গে অটটা হাতি। দলটি যে বাঘটি মারতে চাচ্ছে সেটা এ মুহূর্তে আস্তানা গেড়েছে বনের সেই ব্লকে, যেখানে গুলি করার পাস আছে করবেটের। শিকারী দলটি বনের যে ব্লকে অবস্থান নিয়েছে এবং করবেটের ব্লকটিকে আলাদা করে রেখেছে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বয়ে চলা ধোর নদী। লোকগুলো বাঘটিকে তাদের এলাকাতেই মারতে বদ্ধপরিকর। ওটাকে লোভ দেখিয়ে এ পাড়ে আনার জন্য নদীর এ প্রান্তে চোদ্দটি মোষের বাচ্চার টোপ বাঁধে। বাঘ দুটো মেরেছে আর

www.BanglaBook.org

বাকি বারোটা মারা গেছে শিকারীদের নিতান্ত অবহেলা আর অনাদরে। তবে করবেট গতকাল রাত আনুমানিক নয়টার সময় একটা গুলির শব্দ শুনেছেন।

দুই ঘণ্টা পাথরের পিছনে বসে থাকলেন তিনি। সম্বরটা অনবরত ডেকে চললেও শুয়োরটার কোনও নাম নিশানা দেখলেন না। যখন গুলি করার মত আলো থাকল না, নদী পার হয়ে কোটা রোডে চলে এলেন। প্রথমে দ্রুত পা চালালেও পাহাড়ের গুহাগুলোর কাছে এসে গতি কমিয়ে খুব সাবধানে এগুতে লাগলেন। এই গুহাগুলোতে একটা অজগর আস্তানা বানিয়েছে। আর এখানেই এক মাস আগে বন বিভাগের বিল বেইলে একটা চোদ্দ ফুটি কিং কোবরা গুলি করে মারেন। করবেট গ্রামে ফেরার পথে জোরে চেঁচিয়ে আগামীকাল ভোরে তাঁকে সঙ্গ দেয়ার জন্য মোতিকে প্রস্তুত থাকতে বললেন।

কালাধুঙ্গির জঙ্গলে মোতি ছিল করবেটের দীর্ঘ সময়ের বিশ্বস্ত সঙ্গী। সে একই সঙ্গে উৎসাহী, বুদ্ধিমান এবং চমৎকার শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী। নিঃশব্দে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলাফেরা করাতে তার জুড়ি মেলা ভার। একজন মানুষের পক্ষে যতটা সাহসী হওয়া সম্ভব ততটাই সাহসী সে। কারও সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় উপস্থিত হয়ে যেতে কখনও দেরি করেনি সে।

তো পরদিন সকালে ভোরের শিশির-ভেজা সকালে সদ্য ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা অরণ্যের অধিবাসীদের মিলিত কণ্ঠের হর্ষধ্বনি শুনতে শুনতে এগুতে লাগলেন দুজনে। মাদী সম্বরটার একটানা চেঁচানোর কথা মোতিকে জানিয়ে করবেট বললেন, তিনি অনুমান করছেন নিজের ছোট বাচ্চাটাকে বাঘের হাতে মারা পড়তে দেখেছে ওটা। আর এ কারণে বাঘটা মড়ির কাছে কখন হাজির হয়, তা দেখতে অপেক্ষা করছে। জঙ্গলে এটা তেমন অস্বাভাবিক কোনও ঘটনা নয়। তা ছাড়া ওটার ক্লান্তিহীন ভাবে ডেকে চলার আর কোনও কারণ অনেক চিন্তা করেও মাথায় এল না করবেটের। এদিকে তাজা মাংস খুঁজে পাওয়ার প্রত্যাশায় রীতিমত উল্লসিত হয়ে উঠেছে মোতি। মাসে কেবল একবার পরিবারের জন্য মাংস কেনার সামর্থ্য আছে তার। কোনও বাঘ কিংবা চিতার হাতে নিহত সম্বর, চিত্রল কিংবা শুয়োর খুঁজে পাওয়া যেন তার জন্য দেবতার আশীর্বাদ।

করবেট হিসাব করে দেখেছিলেন গতকাল সন্ধ্যায় সম্বরটা ডেকেছে তার অবস্থান থেকে পনেরো গজ উত্তর দিকে। নির্দিষ্ট জায়গাটিতে পৌঁছে কোনও মড়ি খুঁজে পেলেন না তাঁরা। কিন্তু এখানে যে একটা মড়ি ছিল এবং হত্যাকাণ্ডটি যে একটি বাঘই ঘটিয়েছে এ বিষয়ে করবেট এখনও নিশ্চিত। অতএব তাদের মড়ির কাছে নিয়ে যাবে এমন কোনও চিহ্ন যেমন—রক্তের ছোপ, পশম কিংবা কোনও কিছু টেনে নেয়ার ছাপ—এসবের খোঁজে চারপাশের মাটি গভীরভাবে পরীক্ষা করলেন। কয়েকশ গজ দূরে পর্বতের পাদদেশ থেকে নেমে আসা দুটো অগভীর খাদ এ জায়গাটায় মিলেছে। খাদ দুটো পরস্পরের প্রায় সমান্তরালে ত্রিশ গজ মত

www.BanglaBook.org

এগিয়েছে। মোতি বলল সে মড়ির খোঁজে ডানদিকের খাদের দিকে যাবে আর করবেট অনুসন্ধান চালাবেন অন্য পাশের খাদটায়। যেহেতু খাদ দুটোর মাঝের ঝোপ বেশ নিচু এবং তারা পরস্পরের দৃষ্টিসীমার মধ্যে কাছাকাছি থাকবেন, করবেট প্রস্তাবটা মেনে নিলেন। চারপাশের প্রতিটি জায়গা খেয়াল করতে করতে খুব ধীর গতিতে হেঁটে শ'খানেক গজ এগোলেন তাঁরা। তারপরই মোতি কী করছে দেখার জন্য করবেট সবে ঘাড় ফিরিয়েছেন, এমনি সময় গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে শুরু করল সে—ঘুরে দাঁড়িয়ে দুই হাত শূন্যে ছুঁড়ে পাগলের মত দৌড়াতে শুরু করল। মনে হলো মৌমাছির ঝাঁক তাড়া করছে তাকে। দৌড়ের সঙ্গে চড়া কণ্ঠের চিৎকারও আছে। নিশ্চুপ, সুনসান জঙ্গলে মানুষের কণ্ঠের অপ্রত্যাশিত আর্তচিৎকার মনের মধ্যে কতটা আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়, বলার মত নয়। করবেট জানেন ঘটনাটা আসলে কী। রক্ত কিংবা পশমের খোঁজে মোতির দৃষ্টি ছিল মাটির উপরে, কোথায় চলেছে সেদিকে কোনও খেয়ালই ছিল না তার, এভাবেই এক পর্যায়ে একেবারে বাঘের মুখোমুখি হয়ে যায় সে।

সে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে কিনা তা দেখতে পাচ্ছেন না তিনি, কারণ ঝোপের উপর দিয়ে কেবল মাথা আর কাঁধ নজরে আসছে। দৌড়তে থাকা মোতির ঠিক এক ফুট পিছনে রাইফেলের নিশানা স্থির করে রেখেছেন করবেট। কোনও নড়াচড়ার আভাস পেলে গুলি করবেন। সৌভাগ্যক্রমে এভাবে রাইফেল সহ ঘুরবার সময় এ ধরনের কোনও নড়াচড়া নজরে এল না তাঁর। মোতি শ'খানেক গজ অতিক্রম করতে করবেট নিশ্চিত হলেন, সে এখন নিরাপদ। চিৎকার করে তাকে থামার নির্দেশ দিয়ে জানালেন, তিনি তার কাছে আসছেন। করবেট জানেন না বাঘটা ইতিমধ্যে তার অবস্থান বদল করেছে কিনা—দ্রুত মোতির খাদটায় নেমে এলেন তিনি। একটা গাছের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছে, তার নীচের মাটিতে কোনও রক্তের ছাপ নেই। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন করবেট। আহত হয়নি মোতি। তার কাছে পৌঁছে জিজ্ঞেস করলেন কী ঘটেছে। যখন জানাল কিছুই হয়নি অবাক হলেন করবেট।

মোতি যখন জানতে চাইল বাঘ তার উপর লাফিয়ে পড়েনি বা অনুসরণ করেনি, তখন করবেট জানালেন, বাঘটাকে বাধ্য করার জন্য যা করার করেছেন তিনি।

এবার সে বলল, 'আমি জানি, সাহেব। আমি জানি আমার চিৎকার করা আর দৌড়ানো উচিত হয়নি। কিন্তু কী করব, তখন আতংকে হুঁশ-জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি আমি।' চুপ হয়ে গেল সে। মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

তাড়াতাড়ি মোতির দু'কাঁধ ধরলেন করবেট। কিন্তু তার হাতের বাঁধন থেকে পিছলে ছুটে গিয়ে মাটিতে পড়ল সে। তার মুখ থেকে এক অদৃশ্য যাদুমন্ত্র বলে সমস্ত রক্ত অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আর নড়ল না মোতি। বিন্দু মাত্র নড়াচড়া করছে না। মিনিট পার হচ্ছে,

www.BanglaBook.org

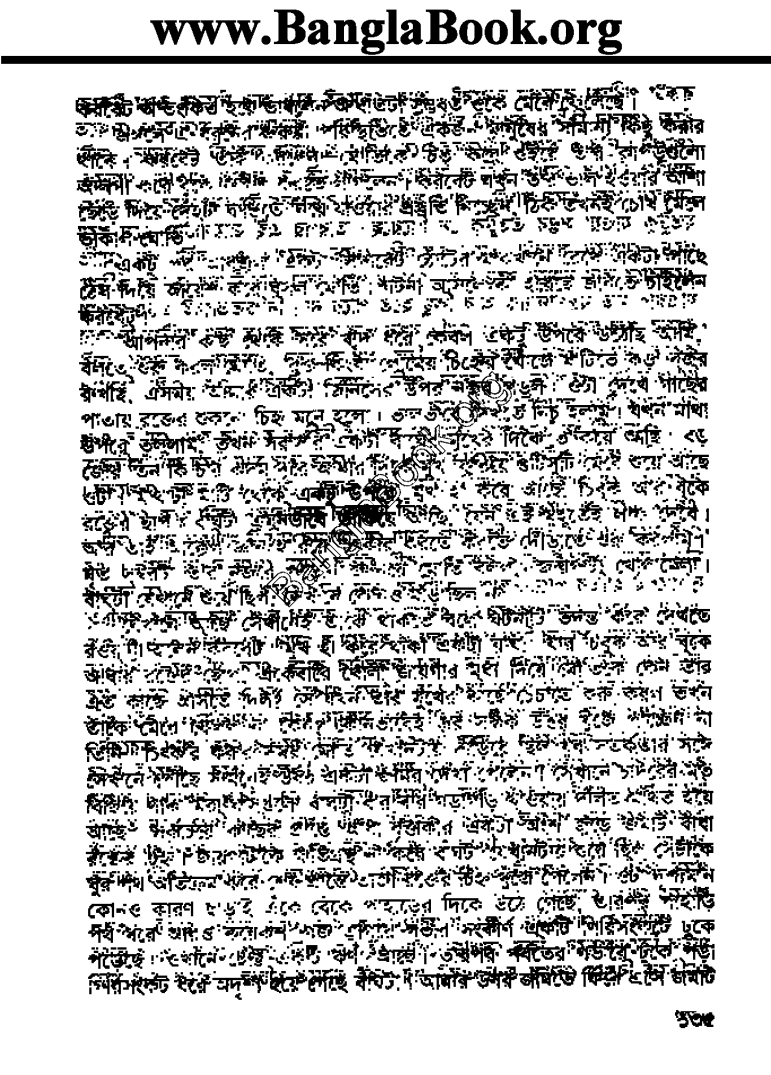

www.BanglaBook.org

রক্তটা পরীক্ষা করলেন করবেট। আর এখানেই হাড় আর দাঁতের ভাঙা টুকরো খুঁজে পেলেন তিনি। করবেট ঘটনাটির যে ব্যাখ্যা খুঁজছেন তা মনোচক্ষে দেখতে পেলেন। দু'রাত আগে রাইফেলের যে গুলির আওয়াজ করবেট পেয়েছেন, সেটা বাঘটার নীচের চোয়াল গুঁড়িয়ে দিয়েছে। তারপরই যে জঙ্গলে আস্তানা গেড়েছে, সেখানে ফিরে আসে বাঘটা। প্রচণ্ড যন্ত্রণা আর রক্তক্ষরণ উপেক্ষা করে তার পক্ষে যতটুকু যাওয়া সম্ভব ততটুকু সে গিয়েছে। তারপর এই জায়গাটায় এসে শুয়ে পড়ে, যেখানে সম্বরটা তাকে গড়াগড়ি খেতে দেখে। ৩০ ঘণ্টা পর মোতি একেবারে তার সামনে পড়ে যায়। কোনও পশুর জন্য তার নীচের চোয়াল গুঁড়িয়ে যাওয়ার মত যন্ত্রণাদায়ক আর কিছু হতে পারে না। নিশ্চিতভাবেই প্রচণ্ড ব্যথায় বাঘের জ্বর চলে আসে এবং মোতি যখন তার কানের কাছে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে থাকে তখন সম্ভবত সে ছিল অর্ধ-অচেতন অবস্থায়। তারপর সেই পিরিয়াদটায়—যেখানে সে জানে পানি আছে—পৌঁছবার শেষ চেষ্টা হিসাবে কোনমতে উঠে জায়গাটা ত্যাগ করে।

অনুমানটি যে একেবারে ঠিক সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য মোতি এবং করবেট জঙ্গলের গুটিং ব্রুকদুটো যেখানে এক হয়েছে তার মধ্য দিয়ে নদী অতিক্রম করলেন। যে জায়গায় চোদ্দটি মোষ বাঁধা আছে, সেটা এক নজর দেখবেন। এখানে এসে যে গাছের উপর বন্দুকধারী তিনজন বসেছিলেন সেটা খুঁজে পেলেন। সেই সঙ্গে পাওয়া গেল গুলি করার সময় যে মোষের মড়িটি খাচ্ছিল বাঘ, সেটি। মড়ির কাছ থেকেই প্রচুর রক্তসহ একটি ট্রেইল নেমে গেছে নদীর দিকে। এর দু'পাশেই হাতির পায়ের ছাপ। মোতিকে ডাঙ্গা তীরে রেখে নদী পার হয়ে নিজের এলাকায় চলে এলেন করবেট। এখানে আবার রক্তের ছাপ আর হাতির পদচিহ্ন খুঁজে পেলেন। রক্তের চিহ্ন গভীর জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ৫-৬ শ' গজ অনুসরণ করে এগোলেন তিনি। ঘন জঙ্গলটার কাছে এসে হাতিগুলো দাঁড়িয়ে পড়ে। এখানে কিছুটা সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর ডানদিকে মোড় নিয়ে কালাধুঙ্গির দিকে চলে গেছে ওগুলো। গত সন্ধ্যায় যখন ওয়োরটাকে একটা গুলি করার সুযোগ খুঁজছিলেন এসময় ফিরতে থাকা হাতিগুলোর দেখা পান করবেট। বন্দুকধারীদের একজন তিনি কোথায় যাচ্ছেন তাও জিজ্ঞেস করে। করবেট উত্তর দিতে কিছু একটা বলবার জন্য এগিয়ে এসেছিল সে। কিন্তু সঙ্গীদের বাধার কারণে পরে মত পরিবর্তন করে। কাজেই দলটি যখন হাতির পিঠে চড়ে তাদের আস্তানা ফরেস্ট বাংলোতে ফিরে যাচ্ছে করবেট তখন বিন্দুমাত্র সতর্কতা ছাড়াই পায়ে হেঁটে সেই জঙ্গলটিতে প্রবেশ করেন। লোকগুলো যেখানে একটি আহত বাঘকে রেখে এসেছে!

মোতিকে যেখানটায় রেখে গিয়েছিলেন সেখান থেকে তাদের গ্রামটা কেবল মাইল তিনেক দূরে। কিন্তু সেখানে পৌঁছতেই তিন ঘণ্টা লেগে গেল। প্রচণ্ড দুর্বল মোতিকে বিশ্রাম দেয়ার জন্য একটু পর পরই থামতে হচ্ছিল। তাকে তার ঘরে

www.BanglaBook.org

রেখে সরাসরি ফরেস্ট বাংলোয় চলে এলেন করবেট। এখানে এসে দেখলেন সেই তিন শিকারি মালামাল গোছগাছ করে হালদুয়ানির দিকে যাওয়া সন্ধ্যার ট্রেন ধরতে বাংলো ছাড়তে একেবারে প্রস্তুত হয়ে আছে। বারান্দার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কিছুটা সময় তাদের সঙ্গে কথা বললেন করবেট। বেশিরভাগ কথা বললেন করবেটই। যখন জানতে পারলেন আহত বাঘটির একটা ব্যবস্থা না করে দ্রুত চলে যাওয়ার কারণ সামাজিক একটি অনুষ্ঠান ছাড়া আর কিছু নয়, তখন বললেন যদি এই আঘাতে মোতি মারা যায় কিংবা তার কোনও গ্রামবাসীকে বাঘ মারে তবে তাদের বিরুদ্ধে মানুষ হত্যার অভিযোগ আনবেন তিনি।

করবেটের সঙ্গে এই কথার পর বাংলো ছেড়ে চলে যায় দলটি। পর দিন সকালে গিরিখাদটার উপরে যেখানে বাঘটি অদৃশ্য হয়েছে ভারি একটা রাইফেল সহ সেটায় প্রবেশ করলেন করবেট। কারও জন্য স্মারক সংগ্রহ করতে নয় এবং বাঘটিকে অবর্ণনীয় কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে। গিরিখাদটির অন্ধিসন্ধি তাঁর চেনা। একটা আহত বাঘের দিকে নজর দেয়ার জন্য করবেটের বাছাই করা শেষ জায়গা এটা। উপর থেকে নীচ পর্যন্ত গিরিখাদটির প্রতিটি অংশ, এবং দুই পাশের পাহাড় সারাদিন তন্ন তন্ন করে খুঁজেও বাঘটির কোন হদিস পেলেন না করবেট। ওটা গিরিখাদে প্রবেশের একটু পরেই রক্তের চিহ্ন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

এর দশদিন পর এক বনকর্মী টহলের সময় একটি বাঘের অবশিষ্টাংশ পেলেন। বাঘটির প্রায় গোটা শরীরটাই খেয়ে ফেলেছে শকুনের দল। এই বছরের গ্রীষ্মে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত বাঘের অপেক্ষায় বসা নিষিদ্ধ করে আদেশ জারি করলেন সরকার। সেই সঙ্গে গুলিতে আহত কোনও প্রাণীকে মারার যথাসাধ্য চেষ্টা করা এবং ঘটনাটি নিকটস্থ বন বিভাগের অফিস ও স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে জানানো বাধ্যতামূলক হলো শিকারিদের জন্য।

ডিসেম্বরে এই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয় মোতি। এপ্রিলে যখন করবেটরা কালাধুঙ্গি ফিরে আসলেন তখন অনেকটাই মানসিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছে সে। কিন্তু তার ভাগ্য ফুরিয়ে এসেছিল। মাস খানেক পর এক রাতে তার জমিতে আসা একটা চিতাবাঘকে আহত করে মোতি। পর দিন গভীর জঙ্গলের মধ্যে ওটাকে অনুসরণ করতে গিয়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতবিক্ষত হয় সে। কোনভাবে এই আঘাত মাত্র কাটিয়ে উঠেছে এমনি সময় দুর্ভাগ্যজনকভাবে একটি গরুর মৃত্যুর দায় এসে পড়ে তার ঘাড়ে। যে-কোনও হিন্দুর জন্য এর চেয়ে বড় অপরাধ আর হতে পারে না। পাশের গাঁয়ের ওই বুড়ো, হাড় জিরজিরে প্রাণীটা পথ ভুলে এই গ্রামে এসে মোতির জমিতে চরে বেড়াচ্ছিল। আর সে ওটাকে তার জমির বাইরে তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করতেই গভীর একটা ইঁদুরের গর্তে খুর গলিয়ে পা ভেঙে বসল প্রাণীটা। পরের কয়েক সপ্তাহ মাটিতে পড়ে কাতরাতে থাকা গরুটার যথাসাধ্য যত্ন-আত্তি করল মোতি। কিন্তু এ সবকিছুই বৃথা করে দিয়ে ধরাধাম ত্যাগ করল অবলা প্রাণীটা। এটা এতই বড় অপরাধ যে স্থানীয় পুরোহিত এটার সমাধান দিতে

www.BanglaBook.org

অপারগ। মোতিকে হারদুয়ারে তীর্থযাত্রায় যাবার আদেশ দিলেন তিনি। অতএব ধার-কর্জ করে কোনমতে হারদুয়ার যাওয়ার খরচ যোগাড় করে সেখানে হাজির হলো সে। এখানকার সবচেয়ে বড় মন্দিরটির প্রধান পুরোহিতের কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করল মোতি। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে তাকে মন্দিরে কিছু অর্থ দান করতে বললেন তিনি। এটা গরু হত্যার অপরাধ থেকে মুক্তি দেবে মোতিকে। তবে আনুগত্য প্রকাশের জন্য তাকে একটি ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। এবার পুরোহিত জিজ্ঞেস করলেন কোন কাজ তাকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দেয়। বিন্দুমাত্র চাতুরির আশ্রয় না নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই সে জানিয়ে দিল শিকার করতে আর মাংস খেতেই সবচেয়ে বেশি আনন্দ পায় সে। এবার পুরোহিত জানালেন ভবিষ্যতে এই দুটো আনন্দ লাভ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে তাকে।

তার অপরাধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েই তীর্থ যাত্রা থেমে গিয়েছিল মোতি। কিন্তু এল আজীবন এক নিষেধাজ্ঞার খড়্গ ঘাড়ের উপর ঝুলিয়ে। তার শিকারের সুযোগ ছিল সামান্যই। কারণ অন্যদের সঙ্গে এক মাত্র গাদা বন্দুকটি ভাগাভাগি করে ব্যবহার করার পাশাপাশি তাকে শিকার করতে হত গ্রামের সীমানার মধ্যেই। তার অবস্থানের কোনও লোকেরই সরকারী সংরক্ষিত বনে শিকারের অনুমতি ছিল না। তবে এত কিছুর পরও পুরনো গাদা বন্দুকটা এবং সেই সঙ্গে সমস্ত আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে করবেট মাঝে মাঝে তাঁর রাইফেল থেকে তাকে যে গুলি করতে দিতেন তা প্রচণ্ড আনন্দ দিত মোতিকে। তার নিষেধাজ্ঞার এই প্রথম অর্ধেক যদি কঠিন হয় তবে পরের অর্ধেক কঠিনতর। পাশাপাশি এটা তার স্বাস্থ্যের উপরও প্রভাব ফেলল। যদিও তার আর্থিক দৈন্য মাংসে কেবল একবার অল্প পরিমাণ মাংস কেনা অনুমোদন করত, বুনো ওয়োর আর সজারুর কোনও অভাব ছিল না। সঞ্জি খাবার লোভে জঙ্গল থেকে রাতে কখনও কখনও গ্রামের খেতে নেমে আসত হরিণ। করবেটদের গ্রামের লোকেরা একটা নিয়ম মেনে চলত, কেউ কোনও প্রাণী শিকার করলে গ্রামের সব লোকের মধ্যে তা ভাগ করে দেয়া হত। এই নিয়মটা করবেট নিজেও মেনে চলতেন। কাজেই মোতিকে কেবল তার কেনা মাংসের উপর নির্ভর করতে হত না।

হারদুয়ার থেকে তীর্থযাত্রা শেষে ফিরে আসার পরের শীতেই মারাত্মক শুকনো কাশি হলো মোতির। কোনও ওষুধেই যখন কাজ হলো না তখন কালাধুঙ্গি অতিক্রম করতে থাকা এক চিকিৎসক বন্ধুর শরণাপন্ন হলেন করবেট। তাঁকে আতঙ্কিত করে দিয়ে বন্ধুটি জানাল, মোতির যক্ষ্মা হয়েছে। বন্ধুর পরামর্শে মোতিকে তিরিশ মাইল দূরের ভাওয়ালি স্বাস্থ্যনিবাসে পাঠালেন করবেট। পাঁচ দিন পর এর প্রধানের কাছ থেকে একটি চিঠি সহ ফেরত আসল সে। এতে জানানো হয়েছে তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে তাদের পক্ষে তাকে স্বাস্থ্যনিবাসে ভর্তি করা সম্ভব হচ্ছে না। এসময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন করবেটদের সঙ্গে থাকা এক মেডিকেল মিশনারি। এই মিশনারি বেশ কয়েক বছর একটি স্বাস্থ্যনিবাসে

www.BanglaBook.org

কাজ করেছেন। তিনি মোতিকে খোলা জায়গায় ঘুমানোর এবং প্রতিদিন সকালে এক পেয়া দুধে কয়েক ফোঁটা প্যারাফিন মিশিয়ে খাওয়ার পরামর্শ দিলেন। কাজেই শীতের বাকি সময়টা খোলা জায়গাতেই শুয়ে কটাল সে। আর যখন করবেটদের বারান্দায় বসে থাকত, একটা সিগারেট ধরিয়ে গল্প করত তার সঙ্গে, আর প্রতিদিন সকালে পান করত করবেটদের গরুর এক পেয়া দুধ।

ভারতের দরিদ্র লোকেরা প্রচণ্ড অদৃষ্টবাদী, সেই সঙ্গে রোগের সাথে যুদ্ধ করার উদ্যম তাদের মধ্যে প্রায় নেই বললেই চলে। করবেটরা যখন তাঁদের গ্রীষ্মকালীন নিবাস নৈনিতালের উদ্দেশে কালাধুঙ্গি ত্যাগ করলেন তখন তাঁদের সাহায্য নয় বরং সঙ্গ বঞ্চিত মোতি বাঁচার সব আশা ছেড়ে দিল। এবং সত্যি এক মাস বাদে মারা গেল সে।

কর্বেটদের পর্বত পাদদেশে বাস করা নারীরা গোটা ভারতের নারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রমী। আর এদের মধ্যে সবচেয়ে পরিশ্রমী হলো মোতির বিধবা স্ত্রী, পুনার মা। সে ছোটখাট গড়নের শক্ত গাঁথুনির এক মহিলা যে একই সঙ্গে প্রচণ্ড কঠোর স্বভাবের এবং পরিশ্রমী। মোতি যখন মারা গেল তখন তার যে বয়স ইচ্ছা করলেই আবার বিয়ে করতে পারত সে কিন্তু নিজের জাতের কথা ভেবে তা থেকে বিরত রাখল নিজেকে। প্রচণ্ড সাহস সেই সঙ্গে অটল বিশ্বাস নিয়ে ভবিষ্যতের মুখোমুখি হলো, নিষ্ঠাভরে সম্পন্ন করে চলল তার কাজগুলো, তার অল্প বয়স্ক ছেলে-মেয়েগুলোর সাহায্যও পেল সে এই সংগ্রামে।

ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পুনর বয়স এখন বারো এবং প্রতিবেশীদের সাহায্য নিয়ে লাঙ্গল টানা সহ খেতের অন্য সব কাজ ঠিকই সামলে নিতে পারে সে। মেয়ে কুন্তির বয়স দশ এবং সে বিবাহিত। পাঁচ বছর পর গ্রাম ছেড়ে স্বামীর ঘরে যাবার আগ পর্যন্ত হাজার এক রকম কাজে মাকে সাহায্য করে গিয়েছে সে। যার মধ্যে ছিল রান্না, বাসন-কোসন ধোয়া এবং কাপড় ধোয়া আর কাচা। নিজের আর ছেলে-মেয়েদের পোশাক-আশাকের বিষয়ে পুনার মা অত্যন্ত সচেতন। কাপড়গুলো যতই পুরানো কিংবা জীর্ণ হোক না কেন, এগুলো থাকতে হত সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; এ ছাড়াও কাত্তিকে বাড়ির নিত্যদিনকার কাজের মধ্যে আরও যেসব কাজ করতে হত তার মধ্যে আছে সেচের নালা কিংবা বোর নদী হতে পানি নিয়ে আসা; জঙ্গল থেকে জ্বালানী কাঠ, দুধেল গাভী এবং বাছুরগুলোর জন্য ঘাস, কচি পাতা সংগ্রহ করে আনা; ফসল নিড়ানো এবং কাটা, একজন পুরুষেরও হাত ব্যথা হয়ে যায় এমন ওজনদার একটি লোহার সাহায্যে পাথরের গর্তে ধান থেকে তুষ আলাদা করা, পুনার জন্য আটা তৈরি করতে মিলে গম নিয়ে যাওয়া; এর পাশাপাশি দুই মাইল দূরের বাজারে যাওয়া তো ছিলই, সেখানে পরিবারের সদস্যদের সামর্থ্য অনুযায়ী স্বল্প খাবার কিংবা পোশাক কিনতে তাকে নিত্যই তুমুল দরাদরি করতে দেখা যেত দোকানিদের সঙ্গে। সবার ছোট শের শিংয়ের বয়স আট। ভোরে চোখ মেলার পর থেকে সন্ধ্যার খাবার খেয়ে

www.BanglaBook.org

চোখ বোজার আগ পর্যন্ত একজন বালকের পক্ষে যতটুকু কাজ করা সম্ভব তা পুরোটাই পরিবার তার থেকে পায়। এমনকী লাঙল টানায়ও পুলককে সাহায্য করে সে, লাঙল ঘুরানোর মত অতটা শক্তি না থাকাতে প্রতিটি টানের শেষে হাত লাগায় সে।

নিতান্ত অনাদরে বেড়ে উঠলেও শের সিং নিঃসন্দেহে গ্রামের সবচেয়ে সুখী ছেলে। যখন তাকে দেখা যায় না তখনও কণ্ঠ শোনা যায়। গান গাইতে পছন্দ করে সে। পরিবারের পশুগুলো—চারটা ষাঁড়, বারোটা গাভী, আটটা বাচ্চা আর বাছুর তত্ত্বাবধান ছিল শের সিংয়ের বিশেষ কাজ। প্রতিদিন সকালে গাইগুলোর দুধ দোয়ানোর পর পুরো পালটাকে গবাদিপশু রাখার চালাঘরটা থেকে বের করে আনে সে, সন্ধ্যায় ঢুকিয়ে রাখে নিজেই। ওগুলোকে গ্রামের চারপাশ ঘিরে থাকা প্রাচীরটার একটা ফাটল দিয়ে ঢুকিয়ে নিয়ে জায়গা পরিষ্কার করতে হয়। এটা করতে করতে সকালের নাস্তার সময় হয়ে যায়। মা কিংবা দাদির ডাক পেলেই দুধের পাতিলটা নিয়ে [illegible] দ্রুত রওনা হয় বাড়ির দিকে। সকালের হালকা নাস্তা হয় থাকে [illegible] গরম চাপাতি আর ডাল, যা রান্না হয় সরিষার তেল দিয়ে—সঙ্গে যার যার প্রয়োজন মত লাল মরিচ এবং লবণ। নাস্তা শেষে বাড়ি থেকে ছোট-খাট যে কাজগুলো থাকে সংসারের সেগুলো করা হয়ে গেলে শুরু হয় তার সত্যিকারের দায়িত্ব। এটা হলো গবাদিপশুগুলোকে জঙ্গলে চরাতে নিয়ে যাওয়া, শুধু চরালেই তো হবে না, ওগুলোকে অন্য কারও জমিতে ঢোকা থেকে বিরত রাখা এবং বাঘ আর চিতাবাঘের কবল থেকে রক্ষা করাও পড়ে তার এই দায়িত্বের মধ্যে। বিশেষ করে বাচ্চাগুলোর দিকে একটা চোখ রাখতে হবে সবসময়। সীমানা দেয়ালের পাশে [illegible] থাকা চারটা ষাঁড় আর আটটা গাভীকে একত্র করে কাঁধে কুড়ালটা ঝুলিয়ে রওনা হয় একেবারে ছোট ছেলেটা, তার পিছন পিছন চলে লাল্লু। প্রতিটি প্রাণীই শের সিংয়ের একান্ত অনুগত, সে নাম ধরে ডাকলেই সাড়া দেয় এবং শের স্ট্রীম পার হয়ে ওগুলোকে নিয়ে সে চলে আসে ওপাশের জঙ্গলের সীমানায়।

শের সিংয়ের প্রিয় লাল্লু তরুণ এক ষাঁড়, ভবিষ্যতে যাকে হাল টানা ষাঁড় হিসাবে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে; তবে কাহিনীটি যখনকার কথা লিখছি তখন সে খুবই ছোট। এক হিসাবে কিন্তু লাল্লু শের সিংয়ের ভাই; কারণ লাল্লু শের সিংয়ের সঙ্গে তার গাভী মায়ের দুধ ভাগাভাগি করে খেয়েছে। শের সিং তার এই ভাইয়ের নাম দিয়েছে লাল্লু, যদিও লাল্লু কিন্তু দেখতে মোটেই লাল রঙের নয়।

তার গায়ের রং হালকা পিঙ্গল, কাঁধের দিকে একটু উজ্জ্বল, আর শরীরের পিছনের অংশের এক পাশে জন্ম থেকেই লেগে গেছে কালো একটা দাগ। লাল্লুর শিং দুটো ছোট হলেও এরই মধ্যে বেশ ধারাল আর শক্তিশালী।

মানুষ এবং অন্য যেকোন প্রাণী যখন প্রতিদিন একই ধরনের বিপদের মুখোমুখি হয় তখন স্বাভাবিক নিয়মেই একজন আরেকজনের মধ্যে সাহস আর

www.BanglaBook.org

আত্মবিশ্বাস ঢুকিয়ে দেয়। শের শিং জঙ্গলেই বেশি সময় কাটিয়েছে। হাঁটতে পারে এমন কোনও প্রাণীকে ভয় করতে শেখেনি এদিকে তরুণ, তেজী লালুর আছে নিজের প্রতি অসাধারণ আত্মবিশ্বাস। শের শিং যখন লালুর মধ্যে সাহসের সঞ্চার করে লালু তখন তাকে দেয় বাড়তি আত্মবিশ্বাস। শের শিংয়ের পশুরা এমন সব জায়গায় চরে বেড়ায় যেখানে অন্যরা যেতেই ভয় পায়। গর্ব অনুভব করে যে তার প্রাণীগুলো গায়ে-গতরে অন্য প্রাণীর চেয়ে অনেক মোটাসোটা। কোনও বাঘ কিংবা চিতাবাঘ আজ পর্যন্ত ওদের উপর আক্রমণ করেনি।

করবেটদের গ্রাম থেকে চার মাইল দূরে গেলে দেখা মিলবে একটা উপত্যকার: পাঁচ মাইল প্রশস্ত উপত্যকাটা উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত। যুক্ত প্রদেশের পাঁচ হাজার বর্গমাইল জঙ্গলের মধ্যে বন্যপ্রাণীতে একে টেক্কা দেয় এমন জায়গা নেই। উপত্যকার উপরের অংশে বয়ে গেছে পরিষ্কার পানির একটি ঝর্ণা। যত এগিয়েছে ততই প্রশস্ত হয়েছে ওটা, পুরনো একটা জামুন গাছের শিকড়ের নীচে অজগরের বাসস্থান গুহাটার মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড বেগে এগিয়ে চলেছে। এই স্ফটিক শুভ্র জলধারা আর এর থেকে নির্গত হওয়া ছোট্ট হ্রদগুলো অসংখ্য প্রজাতির মাছের বাসস্থান, যা আবার অন্তত পাঁচ প্রজাতির মাছরাঙাকে এখানে থাকার উৎসাহ জুগিয়েছে। উপত্যকার ফুল-ফলে শোভিত গাছগুলো মধুপানকারী ও ফলখেকো পাখি আর জন্তুদের আকৃষ্ট করেছে, যা আকৃষ্ট করেছে শিকারি পাখি এবং মাংসাশী প্রাণীদের। গভীর জঙ্গল আর আগুর থেকে লুকিয়ে থাকার মত প্রচুর আড়াল পায় এরা। এদিকে ঝর্ণা চলার পথে স্রোতের টানে পাহাড় থেকে খসে পড়া পাথর কিংবা মাটির উপর দলখাপড়ার মত এক ধরনের ঘাস জন্মে, যা সম্বর আর কাকরদের খুব প্রিয়।

এই চমৎকার উপত্যকাটি করবেটের ঘুরে-বেড়ানোর অত্যন্ত পছন্দের একটি জায়গা। তাঁদের গ্রীষ্মকালীন নিবাস থেকে কালাধুঙ্গি ফিরে আসার অল্প কয়দিন পরের এক শীতের সন্ধ্যার ঘটনা: করবেট এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছেন যেখান থেকে পুরো উপত্যকাটির চমৎকার একটি দৃশ্য পাওয়া যায়। এসময়ই বাম পাশে একটা ঝোপে মৃদু একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল তাঁর: বেশ কিছুক্ষণ মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করতেই নড়াচড়াটা একটা প্রাণী হিসাবে আবির্ভূত হলো, যে একটি খাড়া ঢালে দাঁড়িয়ে রসাল ঘাস খাচ্ছে। প্রাণীটা একটা সম্বরের তুলনায় অনেক পলকা, আবার একটা কাকরের তুলনায় বড়।

কাজেই ওর পরিচয় জানার জন্য খুব আস্তে আস্তে ওটার দিকে এগুতে থাকলেন। ঠিক এমন সময় কয়েকশ গজ নীচে উপত্যকা থেকে একটা বাঘ ডাকতে শুরু করল। করবেটের উৎসাহ সৃষ্টিকারী প্রাণীটাও এই ডাক শুনতে পেয়েছে। আর ওটা যখন ওর মাথা তুলল তখন তিনি বিস্মিত হয়ে আবিষ্কার করলেন ওটা লালু। মাথাটা উঁচু করে স্থির-সতর্কভাবে দাঁড়িয়ে ওটা বাঘের ডাক শুনে যাচ্ছে। বাঘটার ডাক থেমে যেতেই উদ্বেগহীন ভাবে আবার ঘাস চিবুতে শুরু

www.BanglaBook.org

করল প্রাণীটা। এটা লালুর জন্য নিষিদ্ধ জায়গা। কারণ পোষা প্রাণীদের সরকারি সংরক্ষিত বনে চরে বেড়ানোর অনুমতি নেই। তারপর আবার বাঘের আক্রমণের হুমকিতে আছে প্রাণীটা। অতএব ওটার নাম ধরে ডাক দিলেন করবেট। একটু ইতস্তত করে খাড়া ঢাল ধরে নেমে এল ওটা এবং এক সঙ্গে গ্রামের পথে রওয়ানা হলেন তাঁরা। যখন পৌঁছলেন তখন শের সিং তার পশুগুলোকে ছাপড়ায় বাঁধছে। করবেট যখন লালুকে কোথায় পেয়েছেন তা জানালেন তখন সে হেসে উঠে বলল, 'ওর জন্য দুশ্চিন্তা কোরো না, সাহেব। ফরেস্ট গার্ড আমার বন্ধু, সে আমার লালুকে খোঁয়াড়ে আটকে রাখবে না। আর বাঘের কথা যদি বল, নিজেকে রক্ষা করতে জানে লালু।'

এই ঘটনার অল্প কয়দিন বাদেই কালাধুঙ্গি সফরে এলেন প্রধান বন সংরক্ষক স্মিথিজ এবং তাঁর স্ত্রী। তাঁদের ক্যাম্পের জিনিসগুলো নিয়ে বোর ব্রিজ পার হয়ে উটগুলো যখন ফরেস্ট রোডে নেমে এসেছে তখনই তাঁদের সামনে রাস্তার উপর একটা বাঘ গরু মারল। উটগুলোকে এগিয়ে আসতে দেখে এবং তাদের লোকদের চেঁচামেচিতে বিরক্ত হয়ে গরুটাকে ওখানে রেখেই জঙ্গলে ঢুকে পড়ে বাঘটা। উটের সঙ্গে আসা লোকগুলো যখন বাঘের হাতে গরু মারা পড়ার সংবাদ নিয়ে এল তখন স্মিথিজরা করবেটদের বারান্দায় বসে সকালের চা খাচ্ছেন। বাঘটাকে গুলি করার ব্যাপারে মিসেস স্মিথিজ খুব আগ্রহী হয়ে উঠলেন। অতএব দুজন লোক নিয়ে মাচা তৈরি করতে বেরিয়ে পড়লেন করবেট। ঘটনাস্থলে এসে আবিষ্কার করলেন ইতিমধ্যে বাঘটা ফিরে এসে গরুটাকে টেনে জঙ্গলের বিশ গজ ভিতরে নিয়ে গেছে। মাচা তৈরি হয়ে গেলে মিসেস স্মিথিজকে নিতে ফিরে এলেন করবেট। একজন ফরেস্ট গার্ড সহ তাঁকে মাচায় তুলে নিয়ে রাস্তার কিনারে একটা গাছে চড়ে বসলেন নিজে। উদ্দেশ্য—বাঘটার একটা ভাল ছবি তোলা।

তখন বিকাল চারটা। আধ ঘণ্টা ধরে করবেটরা তাঁদের জায়গায় বসে থাকলেন। বাঘটা যেখানে আছে বলে তাঁরা অনুমান করছেন সেদিক থেকে একটা কাকর ডাকতে শুরু করল। এমন সময় রাস্তার নীচের ঢাল থেকে লালুর অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব ঘটল। গরুটাকে যেখানে মারা হয়েছে সেখানে পৌঁছে সতর্কতার সঙ্গে মাটি আর জমে থাকা রক্তের গন্ধ শুঁকল। তারপর ঘুরে রাস্তার কিনারে চলে এল। মাথা উঁচু করে গরুটাকে যে পথ দিয়ে টেনে নেয়া হয়েছে তা অনুসরণ করতে শুরু করল। যখন গরুটা তার নজরে পড়ল ওটাকে ঘিরে চক্কর দিল, খুর দিয়ে মাটিতে ঝড় তুলে রাগে নাক দিয়ে ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করতে লাগল। করবেট ক্যামেরাটা একটা ডালে বেঁধে গাছ থেকে দ্রুত নেমে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ এবং প্রতিবাদমুখর লালুকে গ্রামের কিনারে এনে ছেড়ে দিলেন। কেবল মাত্র গাছটায় আবার চড়ে বসেছেন এমনি সময় দ্বিতীয়বার ওখানে এসে মৃত গরুটাকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করল লালু। মিসেস স্মিথিজ এবার লালুকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য তাঁর সঙ্গের ফরেস্ট গার্ডকে পাঠালেন। লোকটা করবেটকে অতিক্রম করে

www.BanglaBook.org

যাওয়ার সময় তিনি ডেকে লালুকে বোর ব্রিজের ওপাশে দিয়ে আসতে এবং সেখানে হাতির সঙ্গে অপেক্ষা করতে বলসেন। মিসেস স্মিথিজকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এখানে এসে পৌঁছেছে হাতিটা। কিছুক্ষণ হলো কাকরের ডাক থেমে গেছে। এবার মাচার কেবল কয়েক গজ পিছন থেকে কর্কশ শব্দে ডাকতে শুরু করল বন মোরগের দল। ক্যামেরাটা ঠিক করে মিসেস স্মিথিজের দিকে তাকালেই করবেট দেখলেন রাইফেলটা গুলি করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে রেখেছেন তিনি। আর এসময়ই তৃতীয়বারের মত হানা দিল লালু (করবেটরা পরে জেনেছেন ব্রিজের ওপারে নিয়ে যাওয়ার পরে সে চারপাশে ঘুরতে শুরু করে, এক পর্যায়ে নীচে নেমে নদী অতিক্রম করে জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে যায়)। এবার লালু গরুটার দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে গেল। তারপর বাঘটাকে দেখতে পেয়ে কিংবা ওটার গায়ের গন্ধ পেয়ে মাথা নিচু করে জঙ্গলের দিকে তেড়ে গেল, সেই সঙ্গে রুদ্ধ কণ্ঠে চিৎকার করল। তিনবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাল প্রাণীটা, প্রতিবার তেড়ে যাওয়ার পরে আবার আগের জায়গায় ফিরে এল সে, তারপর শিংদুটো উঁচিয়ে নাড়তে নাড়তে এগিয়ে গেল।

মোষদের বাঘকে তার মড়ির কাছ থেকে তাড়িয়ে দিতে দেখেছেন করবেট। গবাদিপশুদেরও চিতাবাঘকে এভাবে তাড়াতে বাধ্য করতে দেখেছেন। কিন্তু হিমালয়ান ভালুক ছাড়া আর কোন প্রাণীকে—এবং লালুর মত একটা অল্প বয়স্ক ষাঁড়কে আগে কখনও শিকারের কাছ থেকে বাঘকে তাড়িয়ে দিতে দেখেননি করবেট।

লালুর যতই সাহস থাকুক তার তো আর বনের মহাপরাক্রমশালী সম্রাট বাঘের সঙ্গে তুলনা চলে না। বাঘ এখন রাগত গর্জনের মাধ্যমে জবাব দিচ্ছে। এদিকে করবেটের শুধুই মনে পড়ে গেল গ্রামের ছোট্ট সেই ছেলেটার কথা, লালুর যদি কিছু হয় তবে তার মন ভেঙে যাবে। এটা স্মরণ করে তিনি কেবল লালুকে সাহায্যের জন্য গাছ থেকে নামতে যাচ্ছেন এমনি সময় চমৎকার খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের পরিচয় দিয়ে বাঘটাকে গুলি করলেন মিসেস স্মিথিজ। এবং ওটার গায়ে লাগাতে ব্যর্থ হলেন। করবেট এবার চিৎকার করে মাহুতকে হাতি নিয়ে আসতে বললেন। করবেট যখন ষাঁড়টাকে তার হুপড়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তখন রীতিমত বাধ্য ছেলের মত তাকে অনুসরণ করল লালু। শের সিং তাকে খোঁয়াড়ে বেঁধে রাখার সময়ও কোন প্রতিবাদ করল না। করবেটের ধারণা যতই হুঁষিতম্বি করুক সে যখন গরুর মড়িটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে তখন বাঘ তার আক্রমণ গ্রহণ না করায় করবেটের মত লালুও হুঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।

এদিন রাত ও পরদিন সকালে বাঘ গরুটাকে খেল। এসময় মিসেস স্মিথিজ আরও একবার বাঘটার গায়ে গুলি লাগানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। তবে করবেট ঠিকই ওটার চমৎকার একটা ছবি নিতে পেরেছেন। এতে খাড়া ঢাল বেয়ে নেমে গিয়ে ছোট্ট একটা পুকুরে পানি খেতে দেখা যাচ্ছে বাঘটাকে।

BanglaBook.org

জঙ্গলই শের শিংয়ের খেলার ময়দান। একমাত্র খেলার জায়গা যা সে চেনে। ঠিক যেমনটি ছিল বালক বয়সে করবেটের। এবং করবেট তাকে যতটুকু চেনেন তিনি যতটুকু জঙ্গল উপভোগ করতেন ততটাই করে সে। প্রচণ্ড বুদ্ধিমান, পর্যবেক্ষণশীল এই ছেলেটির জঙ্গল সম্পর্কে অসাধারণ জ্ঞান। কোনও কিছুই তাকে মনোযোগ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। শের শিং যে প্রাণীটির নাম বহন করছে তার মত অকুতোভয় সে নিজেও।

প্রতিদিনকার সান্ধ্য ভ্রমণে তাদের সবচেয়ে পছন্দের পথ ছিল বোর ব্রিজের দূর প্রান্তে মিলিত হওয়া তিনটি রাস্তার মোড়: একটি মুরাদাবাদের দিকে চলে যাওয়া পশ্চিমের ট্রাঙ্ক রোড, কটা রোড এবং রামনগরের দিকে চলে যাওয়া জঙ্গলের রাস্তা। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত যাবার পর শের শিংকে দেখার আগেই তার কণ্ঠ শুনতে পেতেন করবেট। কারণ গরুগুলো নিয়ে বাড়ি ফিরবার সময় তার প্রচণ্ড আবেগ মাখানো চড়া, পরিষ্কার কণ্ঠে গাওয়া গান শোনা যায় অনেক দূর থেকেও। সবসময়ই চমৎকার হাসি আর সানন্দ হাসিতে তাদের অভিবাদন জানায় সে, আর এসময় তাদের বলার জন্য তার প্রস্তুত থাকে মজাদার কোনও ঘটনা। 'আজ সকালে এই রাস্তায় বড় এক বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে ওটা এসেছে কটা থেকে আর চলে গেছে নয়া গাঁওয়ের দিকে। দুপুরের দিকে ধানিগাদ আখের খেতের নীচের প্রান্ত থেকে ওটার ডাক শুনেছি।' কিংবা 'সারিয়াপানির কাছে শিংয়ে শিংয়ে ঠোকাঠুকির শব্দ শুনে একটা গাছে উঠে দেখি দুটো মদ্দা চিত্রল লড়াই করছে। সাহেব, এদের একটার শিং মস্ত বড়, আর কী নাদুসনুদুস ওটার চেহারা। অনেকদিন মাংস খাইনি আমি।' বা 'আমার সঙ্গে এটা কী?'—কখনও কখনও বা কোনও সবুজ পাতায় মুড়ে লতা দিয়ে পেঁচিয়ে নিজের উস্কো-খুস্কো মাথায় চাপিয়ে হাজির হয় সে।

বা বলল, 'আমার সঙ্গের জিনিসটা একটা শুয়োরের পা। একটা গাছে কিছু শকুন বসে থাকতে দেখে বিষয়টা কি দেখতে যাই আমি। গিয়ে দেখি একটা ঝোপের মধ্যে চিতাবাঘের আধ খাওয়া একটা শুয়োর। গত রাতে ওটাকে মেরেছে সে। তুমি যদি চিতাটাকে মারতে চাও সাহেব, তবে তোমাকে মড়িটার কাছে নিয়ে যাব আমি।'

একদিন বলল সে, 'হলদু গাছের একটা খোড়লে মধুর একটা চাক পেয়েছি আমি।' তারপর গাছের পাশে আর সেই সঙ্গে এর গায়ে জড়িয়ে থাকা কাঁটার মধ্যে লুকিয়ে থাকা তুষার শুভ্র মধুচক্রটা গর্বের সঙ্গে ইশারায় দেখিয়ে দিল। 'আমি তোমার জন্য মধুটা নিয়ে আসব।' তারপর করবেটের হাতের রাইফেলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার কাজ শেষ করে মধুটা তোমার বাসায় নিয়ে যাব আমি। এখন তোমাকে এটা দিলে পথে যদি শুয়োর কিংবা কাকরের দেখা পেয়ে যাও মধু হাতে নিয়ে ওটাকে গুলি করতে পারবে না তুমি।'

তার এই ছোট্ট কুঠারের সাহায্যে হলদু গাছ থেকে চাকটা কেটে বের করে

www.BanglaBook.org

অন্তত কমসে কম দুই ঘণ্টা লেগেছে : আর তা করতে গিয়ে মৌমাছিদের হাতে নির্যাতিত হতে হয়েছে। তার হাত দুটো ফুলে আছে, আর একটা চোখ প্রায় বুজে গেছে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে কিছুই বলল না সে. আর তাকে এ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করা মানে তাকে বিব্রত করা : পরে রাতে করবেটরা যখন ডিনার করছেন তখন নিঃশব্দে কামরায় ঢুকল সে। তারপর সোনার মত চকচক করতে থাকা পালিশ করা পিতলের থালাটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বাম হাতের আঙুল দিয়ে ডান হাতের কনুই ছুঁলো : পাহাড়িদের সম্মান জানানোর এই প্রাচীন রীতি দ্রুতই হারিয়ে যাচ্ছে কালের অতল গর্ভে।

এ ধরনের একটা উপহার নিয়ে আসার পর, থালাটা পর দিন সকালে কুস্তির নিয়ে যাওয়ার জন্য রেখে গিয়ে, নীচের দিকে তাকিয়ে বুড়ো আঙুল নিয়ে কর্ণেটে আঁকিবুকি কাটতে কাটতে হয়তো বা সে বলবে, 'তুমি যদি কাল পখি শিকারে যাও তবে কুস্তিকে পণ্ডগুলোর সঙ্গে পাঠিয়ে তোমার সঙ্গে যাব। আমি জানি কোথায় প্রচুর পখি পাওয়া যাবে।' বাড়ির মধ্যে সব সময়ই সে লাজুক। আর এসব ক্ষেত্রে সে জড়ানো কণ্ঠে যখন কথা বলে তখন মনে হয় তার যেন বলার অনেক কিছু আছে এবং মুখ থেকে কথাগুলো বের করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে সে।

এই পাখি শিকারে শের শিংয়ের ছিল নিজস্ব বাহিনী। গ্রামের ছেলেরা এই পাখি শিকারটা দারুণ উপভোগ করত ঠিক যেমন করতেন করবেট এবং শের শিং। উত্তেজনা আর দিন শেষে বাড়িতে একটা পখি নিয়ে যেতে পারার সম্ভাবনার পাশাপাশি উপরি হিসাবে ছিল আরও কিছু। প্রতিটি শিকারের সময় দিনের মধ্যভাগে আগে থেকে নির্ধারিত কোনও জায়গায় একবার বিরতি টেনে কিছু সময়ের জন্য থিতু হত সবাই। আগে থেকেই লোক পাঠানো হত তাজা মিষ্টি আর শুকনো ছোলা আনার জন্য। আর এতে চমৎকার একটা খাওয়া-দাওয়া হত সবার।

করবেট যখন তাঁর নির্দিষ্ট অবস্থানে দাঁড়ান শের শিং তখন তার সঙ্গীদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করায়। তারপর নির্দিষ্ট জায়গাগুলোয় বিট শুরু হয়। গভীর কোনও অড়হর থেকে পখিগুলোকে করবেটের দিকে তাড়িয়ে আনার সময় জন্যদের কণ্ঠ ছাপিয়ে শোনা যায় শের শিংয়ের চিৎকার। যখনই কোনও পখি গাছ থেকে ডানা মেলে, 'ওটা আসছে, সাহেব! ওটা আসছে,' বলে জোরে চিৎকার জুড়ে দেয় সে। যখন ভারী কোন প্রাণী গাছপালার গভীর আচ্ছাদন থেকে বেরিয়ে আসার শব্দ শোনা যায়, যেটা প্রায়ই ঘটে, তার সঙ্গীদের চিৎকার করে পালাতে না বলে নিশ্চিত করে ওটা কেবল একটা সম্বর কিংবা চিতল অথবা শুয়োর পালানোর শব্দ : দশ থেকে বারোটা ঝোপ-জঙ্গল বিট করা হয় এমন এক দিনে ধরা পড়ে সমান সংখ্যক ময়ূর আর বনমোরগ, দুই থেকে তিনটে খরগোশ এবং হয়তো বা একটা শুয়োর কিংবা সজারু। শেষ বিটের শেষে শিকারের থলিটা ভাগ করা হত

www.BanglaBook.org

বিটার আর শিকারির মধ্যে। কিংবা শিকারের পরিমাণ কম হলে কেবল বিটারদের মধ্যে। দিনের শেষে পালক সমেত একটা ময়ূর কাঁধে নিয়ে গর্বের সঙ্গে বাড়ি ফিরবার সময় সে যতটা আনন্দ পেত কিংবা তাকে যতটা খুশি দেখা যেত অতটা দেখা যেত না আর কখনোই।

পুনা এখন বিবাহিত। সেই সঙ্গে শের শিংয়ের বাড়ি ছাড়ার সময় ঘনিয়ে আসছে দ্রুত। কারণ ছয় একরের এই ছোট্ট নিবাসে দুই ভাই একত্রে থাকার মত পর্যাপ্ত জায়গা নেই। গ্রাম আর তার প্রিয় জঙ্গল ছেড়ে যেতে হলে শের শিংয়ের মন যে একেবারে ভেঙে যাবে, এটা করবেটের চেয়ে ভাল করে জানে না আর কেউ। অতএব তাকে তার এক বন্ধুর কাছে শিক্ষানবিস হিসেবে কাজ করতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। করবেটের এই বন্ধুটির কাঠগুদামে একটা গ্যারেজ আছে, নৈনিতাল রোডে গাড়ির একটা সার্ভিসও চালায় সে। করবেটের ইচ্ছা প্রশিক্ষণ শেষে তাদের গাড়ির চালক হিসেবে নিয়োগ করবেন শের শিংকে। পাশাপাশি শীতের সময়ও শিকার অভিযানে সঙ্গ দেবে এবং গ্রীষ্মে করবেটরা নৈনিতালে থাকাকালীন কালাধুঙ্গিতে তাদের কটেজ এবং বাগানেরও দেখাশুনা করতে পারবে। করবেট যখন শের শিংকে তাঁর পরিকল্পনা খুলে বললেন তখন আনন্দে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ল সে। কারণ এটা তাকে স্থায়ীভাবে গ্রামে থাকার নিশ্চয়তা দেবে আর দেবে জন্মের পর থেকে যে বাড়ি ছেড়ে সে যায়নি তার একেবারে কাছাকাছি থাকার সুযোগ।

মানুষ জীবনে কত পরিকল্পনাই না করে, আর যখন এর কিছু কিছু আলোর মুখ দেখে না তা নিয়ে হা-হুতোশ করা উচিত কিনা সে বিষয়ে কখনওই নিশ্চিত হতে পারেননি করবেট। নভেম্বরে করবেটরা কালাধুঙ্গিতে ফিরে আসার পর তার শিক্ষানবিসকাল শুরু করার কথা শের শিংয়ের। কিন্তু অক্টোবরে ম্যালিগনেন্ট ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলো সে, যা এক পর্যায়ে নিউমোনিয়ায় রূপ নিল এবং করবেটরা ফিরবার কয়েকদিন আগেই পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নিল সে। তার বালক বয়সের বছরগুলোতে মনের আনন্দে গান গেয়ে বেড়িয়েছে সে, কে জানে এই পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে পরবর্তী দিনগুলোও তার সেই প্রথমদিককার বছরগুলোর মত এত সুখী এবং মুক্ত-স্বাধীন হত কিনা?

হিটলারের যুদ্ধে স্বাস্থ্যের উপর দিয়ে যে ধকল গেছে তা কাটিয়ে ওঠার জন্য নতুন পরিবেশে যাওয়ার জন্য কালাধুঙ্গি ছাড়ার আগে গ্রামবাসীদের একত্র করলেন করবেট। এই নিয়ে তৃতীয়বার এভাবে গ্রামবাসীকে এক সঙ্গে জমায়েত হতে বললেন করবেট। উদ্দেশ্য তাদের সম্পত্তি বুঝে নিতে এবং নিজেদেরই গ্রাম চালানোর জন্য প্রস্তুত হতে বলা। গ্রামবাসীদের পক্ষে এবার বক্তা ছিল পুনার মা। করবেটের বক্তব্য শেষ হতেই দাঁড়িয়ে তার স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলতে শুরু করল সে, তুমি অযথাই কাজের মাঝখান থেকে আমাদের ডেকে এনেছ। আমরা আগেই তোমাকে জানিয়েছি এবং এখন আবারও বলছি আমরা তোমার কাছ থেকে

www.BanglaBook.org

তোমার জমি নেব না। ওরকম করার অর্থ আর তোমার লোক থাকব না আমরা। আর এখন, সাহেব, শয়তানের ছেলে সেই শূকর ছানার কী হবে যে তোমার দেয়ালের উপরে উঠে আমার আপু খেয়ে ফেলে? পুনা কিংবা এই সব লোক ওটার গায়ে গুলি লাগাতে পারবে না আর পুরো রাত জেগে থেকে টিনের ক্যানেস্তারা বাড়ি দিতে দিতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

বোন ম্যাগিকে নিয়ে করবেট পাহাড় ঘিরে থাকা ফায়ার-ট্রেক ধরে হাঁটছেন এমন সময় বুড়ো শয়তান যে কিনা বছরের পর বছর গায়ে গাদা বন্দুকের ছররা নিয়ে ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছিল আর পরে পুরো রাতভর দুর্ধর্ষ লড়াইয়ের পর বাঘের হাতে প্রাণ হারিয়েছিল, তার সুযোগ্য সন্তান সেই ধাড়ি ওয়োরটা তাঁদের সামনে দিয়ে ছুটে গেল। সূর্য ডুবে গেছে আর দূরত্বটা অনেক বেশি, প্রায় তিনশ' গজ। তবে এর পরও অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রামের দিকে ছুটে চলা বদ প্রাণীটার দিকে একটা গুলি ছোঁড়া সমর্থন যোগ্য। করবেট নিশানা ঠিক করলেন। ওয়োরটা খাড়া একটা ঢালের কিনারে এসে থেমেছে। একটা গাছের গায়ে রাইফেলটা ঠেকিয়ে অপেক্ষায় রইলেন। যখন ট্রিগার টিপলেন খাদের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল প্রাণীটা, তারপর হাঁচড়ে-পাঁচড়ে কোনও মতে খাদের দূরবর্তী প্রান্তে পৌঁছে গেল। পরমুহূর্তেই আবার পূর্ণ বেগে দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। 'তুমি কি ওটার গায়ে গুলি লাগাতে পারোনি?' প্রশ্ন করলেন ম্যাগি। ডেভিডের চোখেও একই প্রশ্ন। ওয়োরটার দূরত্বের হিসাবে ভুল করা ছাড়া এখন থেকে ওটার গায়ে গুলি না লাগাতে পারার কোনও কারণ খুঁজে পেলেন না করবেট। রাইফেলের রূপালি সাইটের মাঝখান দিয়ে ওটার কালো চামড়া পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি, তা ছাড়া গাছটা লক্ষ্য স্থির রাখতে সাহায্য করেছে তাঁকে। যা হোক, এখন বাড়ি ফেরবার সময় হয়ে গেছে। তবে গবাদি পশু চলাচলের ঢালু যে রাস্তাটা ধরে ওয়োরটা পালিয়েছে ওটাই তাদের বের ব্রিজে নিয়ে যাবে, তাই পথে তার গুলির ফলাফল দেখার সুযোগ মিলল। যেখানে প্রাণীটা লাফিয়ে পড়েছে সেখানের মাটিতে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। খাদের দূর প্রান্তে যাওয়ার সময় গতি কমে যায় ওটার। মাটিতে তাজা রক্তের ছাপ পাওয়া গেল। ওয়োরটা যে পথে পালিয়েছে সেদিকে দুইশ' গজ এগুলে চিকন কিন্তু ঝোপ-জঙ্গলে ঠাসা গভীর একটা জঙ্গল। রক্তের গভীর ছাপ দেখে মনে হচ্ছে এই গভীর ঠাসবুনোটের ভেতরে সকালে ওটাকে মৃত পাবেন তিনি। কিন্তু ওটা মারা না গিয়ে থাকলে তবেই সমস্যা। সকালে ম্যাগি তাঁর সঙ্গে থাকবে না, আর গুলি করার মত বেশি আলো পাবেন তিনি।

পুনা গুলির শব্দ শুনেছে। এখন সে ব্রিজের উপর তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। 'হ্যাঁ,' তার কৌতূহলী অনুসন্ধানের উত্তরে জানালেন করবেট, 'আমি যে প্রাণীকে গুলি করেছি সেটা ওই ধাড়ি ওয়োরটাই। রক্তের ছাপ দেখে মনে হচ্ছে ওটা মারাত্মক আহত হয়েছে।' তারপর তিনি যোগ করলেন সে যদি কাল সকালে

www.BanglaBook.org

করবেটের সঙ্গে এই ব্রিজে মিলিত হয় তবে শুয়োরটা কোথায় আছে তাকে দেখিয়ে দিতে পারবেন তিনি। পরে যেন কিছু লোক নিয়ে গিয়ে ওটাকে নিয়ে আসতে পারে।

'আমি কি সঙ্গে বুড়ো হাবিলদারকে নিয়ে আসব?' পুনা এই প্রশ্ন করতেই সম্মতি জানালেন করবেট। এই দয়ালু বৃদ্ধ গুর্খা হাবিলদার গ্রামের সবার শ্রদ্ধা আর ভালবাসা জয় করে নিয়েছে নিজের যোগ্যতা দিয়ে। সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়ে পুলিশে যোগ দেয়ার পর গত বছর অবসর নেয় সে। তারপর দুই সন্তান আর স্ত্রীসহ করবেটদের দেয়া গ্রামের একটা জায়গাতেই বাস করতে শুরু করে। অন্য সব গুর্খাদের মত হাবিলদারের মধ্যেও শুয়োরের মাংসের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত একটা আকর্ষণ কাজ করে। কাজেই করবেটের কিংবা তাঁর গ্রামবাসীদের কারও হাতে যখন কোনও শুয়োর মারা পড়ে, তো গুলিটা যেই করুক না কেন, সেটা কোনও বিষয় নয়, এই প্রাক্তন সৈনিক-পুলিশ তা থেকে তার একটা ভাগ আদায় করে নেবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পর দিন সকালে করবেট ব্রিজে পৌঁছে দেখলেন পুনা এবং হাবিলদার তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। গবাদি পশু চলাচলের রাস্তাটা ধরে এগিয়ে গতকাল যেখানে রক্তের ছাপ দেখেছেন করবেট, দ্রুত সেখানে পৌঁছে গেলেন তাঁরা। এখান থেকে পরিষ্কার রক্তের চিহ্ন ধরে এগুতে লাগলেন। করবেট যা আশংকা করেছেন ওটা তাঁদের গভীর জঙ্গলের দিকে নিয়ে গেল। জঙ্গলের কিনারেই সঙ্গীদের ছেড়ে গেলেন করবেট। কারণ, আহত শুয়োর এক ভয়ঙ্কর প্রাণী। আর করবেটদের জঙ্গলে ভাগ্নুক বাদে এই শুয়োরই একমাত্র প্রাণী, যে আক্রান্ত হলে দুর্ভাগা লোকটির শরীরে চড়ে বসে, চিরে ফালাফালা করে ফেলে। কাজেই বিশেষ করে আহত শুয়োরের বড় দাঁত যদি থাকে, খুব সতর্কতার সঙ্গে তার পিছু নেয়া উচিত। করবেট যেখানে আশা করেছেন সেখানে ওটা চলায় বিরতি টেনেছে, কিন্তু মরেনি। আর দিনের আলো ছড়াতেই রাতভর যেখানে আশ্রয় নিয়েছিল সেটা, সেই গভীর জঙ্গল ছাড়ে সে। শিস দিয়ে পুনা আর হাবিলদারকে ডেকে আনলেন করবেট। তারপর তাদের নিয়ে প্রাণীটার পায়ের ছাপ ধরে এগুতে লাগলেন।

ট্রেইলটা তাদের রুয়ার ট্র্যাকের মধ্য দিয়ে নিয়ে গেল। আর যে পথে এটা চলেছে সেটা নিশ্চিতভাবেই পাহাড়ের দূর প্রান্তের গভীর জঙ্গলের দিকে গিয়েছে। করবেটের অনুমান গত সন্ধ্যায় সেখান থেকেই ওটা গ্রামের দিকে আসে। আজ সকালের রক্তের ছাপ অনেকটাই হালকা, যতই এগুতে লাগলেন ওটা আরও হালকা হতে থাকল এবং এক পর্যায়ে এক দঙ্গল গাছপালার মধ্যে একেবারে হারিয়ে গেল। করবেটরা এখন যে জায়গাটায় এসে পৌঁছেছেন তার সামনেই কোমর পর্যন্ত লম্বা শুকনো খটখটে ঘাস। শুয়োরটা এখান দূরের গভীর জঙ্গলের দিকে এগুচ্ছে, করবেটের ধারণা আঁটট থাকার ঘাসের জঙ্গলটার ভিতরে প্রবেশ করলেন তিনি। যদি আবার ওটার অন্য প্রান্তে পায়ের ছাপ খুঁজে পান?

www.BanglaBook.org

হাবিলদার বেশ কিছুটা পিছনে থাকলেও পুনা কয়েক পা পিছন থেকেই অনুসরণ করছে তাঁকে। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যখন কিছুটা পথ এগিয়ে এসেছেন এমন সময় করবেটের উলের কাপড় নিচু একটা ঝোপের কাঁটায় আটকে গেল। তিনি যখন কাঁটা থেকে পোশাকটাকে মুক্ত করার জন্য সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন পুনা তখন কাঁটা ঝোপটাকে এড়ানোর জন্য কয়েক কদম ডানে সরে গিয়েছে। করবেট কেবল মুক্ত হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন এমন সময় ঝোপের বাইরে শুয়োরটাকে দেখতে পেলেন। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠে সাদা শার্ট পরা পুনার দিকে দৌড়ে গেল ওটা। জঙ্গলে বিপজ্জনক কোন প্রাণীকে অনুসরণের সময় তিনি আক্রান্ত হলে তাঁর সঙ্গীদের যে কাজটি করতে বলেন এবার নিজে ঠিক তাই করলেন করবেট। তাঁর রাইফেল থেকে শূন্যে গুলি ছুঁড়ে দিয়ে গায়ের জোরে চিৎকার করতে শুরু করলেন।

কাঁটায় তাঁর কাপড় যদি আটকে না যেত আর এতে এই সামান্য সময় নষ্ট না হত, তবে সব কিছু ঠিক মতই এগুত। তা হলে পুনাকে বাগে পাওয়ার আগেই প্রাণীটাকে গুলি করতে পারতেন তিনি। কিন্তু এখন শুয়োরটা পুনার কাছে পৌঁছে যাওয়ায় কেবল একটা কাজই তাঁর করার ছিল। ওটার দৃষ্টি অন্য দিকে সরিয়ে নিতে চাইলেন। এখন শুয়োরটাকে লক্ষ্য করে গুলি করা মানেই পুনার জীবনকে সংশয়ে ফেলে দেয়া। রাইফেল থেকে গুলিটা যখন বের হয়ে এল, কলজে কাঁপানো কণ্ঠে 'সাহেব' বলে চিৎকার করে উঠে শুয়োরটাসহ পুনা উল্টে পড়ল ঘাসের উপর। কিন্তু করবেটের চিৎকার আর গুলির শব্দে ভড়কে গিয়ে প্রাণীটা পুনাকে ছেড়ে প্রচণ্ড বেগে তাঁর দিকে ঘুরে গেল। .২৭৫ রাইফেলে নতুন একটা কার্তুজ ঢোকানোর আগেই ক্রুদ্ধ জানোয়ারটা প্রায় তাঁর ঘাড়ের উপরে এসে পড়েছে। রাইফেলের উপর থেকে ডান হাতটা সরিয়ে এনে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিতেই হাতের বাড়ি পড়ল শুয়োরটার উপর। এবং স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল প্রাণীটা। করবেটের মনে হলো তিনি বেঁচে গেলেন কেবল তাঁর মৃত্যুর সময় হয়নি বলে। কারণ ওটা এমনই বিশাল আর ক্রুদ্ধ ছিল যে একটা ঘোড়াকে ছুঁড়ে ফেলতে এবং দাঁত দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করতে পারত। শুয়োরটার শরীরের গতি থেমে গেলেও মাথা তখনও দারুণ সচল। তখনও বিশাল দাঁতের সাহায্যে দুই পাশে চিরে ফালাফালা করে দেবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ওটা। ওগুলো করবেটকে না ছুঁলেও শুয়োরটার কর্কশ কপালে লেগে তাঁর হাতের তালুর চামড়া ছড়ে গেল। তারপর অজ্ঞাত কোনও কারণে ঘুরে গেল জানোয়ারটা, আর ওটা ঘুরতেই দ্রুত দুটো গুলি তার শরীরে ঢুকিয়ে দিলেন করবেট। সামনে মুখ থুবড়ে পড়ল শুয়োরটা।

সেই কলজে চেরা আর্তনাদের পর পুনা আর একটা শব্দও করেনি। কোনরকম নড়াচড়া নেই। তার মাকে কী জবাব দেবেন, এটা ভেবে হাত-পা ঘামতে শুরু করেছে করবেটের, তার চেয়েও বড় কথা পুনার মা করবেটকে কী

www.BanglaBook.org

বলবে, ভাবতে ভাবতে ঘাসের যেখানে সে পড়ে আছে সেদিকে এগুতে লাগলেন। করবেট আশংকা করছেন শরীর চিরে ফালাফালা করা অবস্থায় তাকে খুঁজে পাবেন। কাছে গিয়ে দেখলেন চিত হয়ে শুয়ে আছে সে, তার চোখ দুটো বন্ধ। তবে পুনার সাদা কাপড়ে রক্তের কোনও চিহ্ন না দেখে আতংকের প্রথম ধাক্কাটা করবেটের কেটে গেল। তার কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিয়ে করবেট জানতে চাইলেন, সে কেমন আছে আর কোথায় আঘাত পেয়েছে; অত্যন্ত দুর্বল কণ্ঠে পুনা বলল, 'সাহেব, আমি শেষ হয়ে গেছি; কোমরটা মনে হয় ভেঙে গেছে।' তার শরীরটা ধরে সতর্কতার সঙ্গে বসিয়ে দিলেন করবেট : তিনি ছেড়ে দেবার পরও যখন সে নিজে থেকেই বসে থাকতে পারল খুশি হয়ে উঠলেন করবেট : তার শরীরের পিছনে হাত দিয়ে আশ্বস্ত করলেন, কোমর ভাঙেনি। মাথা ঘুরিয়ে পিছন দিকে তাকাল সে, হাত দিয়ে ধরে নিশ্চিত হলো সেখানে একটা কাটা গাছের গোড়া মাটি থেকে দুই তিন ইঞ্চি মাথা উঁচু করে আছে। নিশ্চিতভাবেই ওয়োরটা যখন তাকে ছুঁড়ে মারে তখন পুনা ধরে নেয় এই গাছের গোড়ার উপরই পড়েছে সে, আর এতেই উপসংহারে পৌঁছে যায় যে তার পিছনটা ভেঙে গেছে।

আর এভাবেই শয়তানের ছেলে ধাড়ি ওয়োর মারা গেল : আরেকটু হলেই মারত দু'জনকে। করবেটের হাতের সামান্য চামড়া ছড়ে যাওয়া ছাড়া তাঁদের আর কোনও ক্ষতি করতে পারেনি সে। পরীরে এক বিন্দু আঁচড়ের দাগ নেই, সেই সঙ্গে বলার মত অসাধারণ একটি গল্প নিয়ে উঠে দাঁড়াল পুনা।

এদিকে হাবিলদার ওয়ানী প্রাচীন সৈনিকের মত রয়ে গেল পিছনেই। তবে তা সত্ত্বেও ওয়োরটার একটি বড় অংশ দাবি করতে ভুল করল না।

পুনা এখন তার বাবার জন্য করবেটের তৈরি করে দেয়া বাড়িতে একটা পরিবার পরিচালনা করছে। তার স্বামীর সংসারে যোগ দেয়ার জন্য গ্রাম ছেড়েছে কুন্তি, আর শের সিং চির নিদ্রায় শুয়ে আছে তার শান্তির শিকার ভূমিতে। পুনার মা বেঁচে আছে এখনও।

আপনি যদি গ্রামটির প্রবেশ দরজায় থেমে পুনার বাড়ির দিকে চলে-যাওয়া মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে যান, দেখবেন পুনার মা পরিবারের জন্য খুশি মনে প্রচণ্ড পরিশ্রমের হাজার এক রকম কাজ করে যাচ্ছে, যেমনটি করত মোতির বধূ হয়ে করবেটদের গ্রামে আসার পর।

যুদ্ধের বছরগুলোতে শীতের সময়টা কালাধুঙ্গিতে তাঁদের বাংলোয় একাই কাটিয়েছেন ম্যাগি। কোনও ধরনের যানবাহন ছাড়া, যেখানে এখান থেকে সবচেয়ে কাছের বসতিটির দূরত্বও চোদ্দ মাইল। কিন্তু তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে করবেটের মনে বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা ঠাঁই পায়নি কখনও, কারণ তিনি জানতেন তাঁর বোন ভারতের বন্ধুভাবাপন্ন দরিদ্র লোকদের মাঝে নিরাপদেই থাকবে।

---

www.BanglaBook.org

## দুই ভাই

এক সকালে নাস্তা শেষে নিজেদের কালাধুঙ্গির বাংলোর বারান্দায় বসে আছেন তাঁরা দু'জন। করবেটের বোন ম্যাগি নিজের জন্য একটা পুলওভার বুনছেন। আর করবেট তাঁর পছন্দের একটা বড়শি মেরামতের কাজ করছিলেন। এমন সময় অনেক তালি দেয়া পরিষ্কার সুট পরা এক লোক বারান্দায় উঠে এল। হাসিমুখে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'চিনতে পারছেন?'

বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন পেশা আর নানান শ্রেণীর লোক এ-বাংলোয় প্রায়ই নানা প্রয়োজনে এসে হাজির হয়। কারণ, বাংলোটার অবস্থান পাহাড়ের ঢালে, দুটো রাস্তা যেখানে মিশেছে। পাশেই চাষের জমি আর জঙ্গল। বিনা দ্বিধায় অনেকেই এই বাংলোয় চলে এসেছে। বিগত বছরগুলোতে হাজার হাজার সাহায্যপ্রার্থী বাংলোতে পা রেখেছে। তারমধ্যে বিভিন্ন রকমের রোগী আর আহত লোকদের সংখ্যাই হাজার ছাড়িয়ে যাবে. জঙ্গলে হিংস্র জন্তুর মধ্যে বিপজ্জনক সব কাজ করতে হয় অনেক মানুষকে। ফলে হিংস্র প্রাণীর আক্রমণে আহত হয়েও অনেক কেউ কেউ।

একবার এক মহিলা একদিন সকাল ভোরে হাজির হয়ে জানাল গত সন্ধ্যায় ফোঁড়ায় লাগানোর জন্য তার ছেলেকে যে মলমটা দেয়া হয়েছিল সেটা খেয়ে ফেলে এখন আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছে সে। যেহেতু ওষুধটা তার কোনও কাজে আসছে না তাই সেটা যেন বদলে দেয়া হয়। আরেক দিন সন্ধ্যার ঘটনা— অনবরত চোখের জল ফেলতে ফেলতে মুসলমান এক বৃদ্ধা আসলো করবেটদের বাংলোয়। নিউমোনিয়ায় মরতে বসা তার স্বামীকে বাঁচানোর জন্য ম্যাগিকে অনুরোধ করতে লাগল সে। ম্যাগি তাকে কিছু এম এন্ড বি ৬৯৩ বড়ি দিলেন। ট্যাবলেটগুলোর দিকে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, মৃতপ্রায় একজন মানুষকে সুস্থ করার জন্য কি এগুলো যথেষ্ট? এবং পর দিন সকালে সে হাসিমুখে এসে জানাল তার স্বামী এখন সুস্থ। সঙ্গে নিয়ে আসা চার বাচ্চাবীর জন্যও সে একই ওষুধ চাইল, কারণ তাদের প্রত্যেকের স্বামীই তার স্বামীর বয়সী। যে কোনও সময় তারাও নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে। আবার আট বছরের সেই ছোট্ট মেয়েটা, সে এত ছোট যে বাংলোর দরজার হুড়কো খুলতেই তাকে বেশ কসরত করতে হলো। তার চেয়েও বছর দু'য়েকের ছোট একটা ছেলের হাত চেপে ধরে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে আসে মেয়েটা। ছেলেটার চোখের ক্ষতের জন্য অষুধ চায় সে। পাছে ছেলেটা চোখ দেখাতে না দেয় সেই ভয়ে ছেলেটাকে জোর করে শুইয়ে দিয়ে মাথাটা নিজের হাঁটুর মাঝখানে চেপে ধরে বলল, 'মেম সাহেব,

www.BanglaBook.org

তুমি এখন তাকে যা ইচ্ছা করতে পার।' ছয় মাইল দূরের এক গ্রামের মোড়লের মেয়ে সে। তার সহপাঠী চোখের আঘাত পাওয়ায় কষ্ট পাচ্ছে দেখে চিকিৎসার জন্য তাকে ম্যাগির কাছে নিয়ে এসেছে সে। ছেলেটার চোখ মোটামুটি ভাল না হওয়া পর্যন্ত পুরো এক সপ্তাহ ধরে সামারিতান নামের মেয়েটা তাকে নিয়ে করবেটদের বাংলোতে আসা-যাওয়া করত। এজন্য প্রতিদিন তাকে অতিরিক্ত চার মাইল পথ হাঁটতে হয়েছে।

তারপর ধরা যাক দিল্লীর সেই করাতির কথা। খোঁড়াতে খোঁড়াতে একদিন সে তাদের সীমানায় ঢোকে। একটা শুয়োর দাঁত দিয়ে তার ডান পায়ের গোড়ালি থেকে হাঁটুর পিছন পর্যন্ত চিরে ফালাফালা করে দিয়েছে। যতক্ষণ লোকটার পায়ের পরিচর্যা চলছিল ততক্ষণ সে একনাগাড়ে শুয়োরটাকে অভিশাপ দিচ্ছিল। আগেরদিন কাটা গাছটা করাত দিয়ে চিরতে গেলে ওটার ডালপালার ভিতর আশ্রয় নেয়া শুয়োরটা বেরিয়ে এসে তার পা দাঁত দিয়ে চিরে দেয়। করবেট যখন বললেন এটা তার দোষেই হয়েছে, সে কেন শুয়োরের চলার পথে পড়েছে, সে রেগে গিয়ে বলল, দৌড়াদৌড়ির জন্য যেখানে পুরো জঙ্গল পড়ে আছে সেখানে ওটার কী দরকার ছিল তার দিকে দৌড়ে আসবার। সে তো জন্তুটাকে আক্রমণ করতে যায়নি। আসলে সে শুয়োরটাকে দেখতেই পায়নি।

এবার অন্য এক করাতির গল্প। একটা কাঠের গুঁড়ি চেরার সময় হঠাৎ তার হাতের তালুতে বিশাল এক কাঁকড়া বিছে কামড়ে দেয়। চিকিৎসার পর মাটিতে গড়াগড়ি খেতে খেতে চিৎকার করে ভাগ্যকে অভিশাপ দেয় আর বলে, 'তাদের ওষুধ তার কোনও কাজেই লাগেনি।' কিন্তু একটু পরই দেখা গেল হাসতে হাসতে তার দম বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। ঘটনাটা ঘটেছিল বাচ্চাদের বার্ষিক এক উৎসবের দিনে। দৌড় প্রতিযোগিতার পর দুইশো ছাত্র-ছাত্রী আর তাদের মায়েদের মিষ্টি ও ফল খাওয়ানো হলো। খাওয়া-দাওয়ার পর শুরু হলো এক মজার খেলা। দু'জন লোক দুটো বাঁশকে খাড়া করে ধরে রাখল। বাঁশ দুটোর মাঝখানে সুতো দিয়ে ঝুলানো নানা জাতের বাদাম ভর্তি একটা কাগজের প্যাকেট। প্যাকেটটা ছোঁড়ার জন্য প্রস্তুত চোখ বাঁধা একটা ছেলে। তারপরই ছেলেটা তার হাতের লাঠি দিয়ে কাগজের ঠোঙা বাড়ি দিতে গিয়ে বাঁশ ধরে রাখা একজন লোকের মাথায় বাড়ি মারল। ঠিক তখনই ওই কাঁকড়াবিছার কামড় খাওয়া লোকটা প্রচণ্ড জোরে হাসতে শুরু করে। করবেট যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এখন তার ব্যথা কোথায় গেছে, তখন সে জানাল, ব্যথা তো না-ই বরং এমন একটা মজার ঘটনা দেখার জন্য অসংখ্য কাঁকড়া বিছার কামড় খেতেও সে রাজী।

করবেটের পরিবার কত বছর ধরে এখানকার লোকদের কী চিকিৎসা করে যাচ্ছে তা তিনি নিজেও জানেন না। তবে ভারতীয়দের, বিশেষ করে গরীব লোকদের স্মরণশক্তি খুব ভাল। সামান্য উপকার পেয়েছে এমন লোকও ওই

www.BanglaBook.org

পরিবারের প্রতি চির কৃতজ্ঞ। করবেটদের কালাধুঙ্গির বাংলোয় যারা আসত তাদের সবাই কিন্তু রোগী নয়। রোদ-ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে দিনের পর দিন দুর্গম পাহাড়ী রাস্তা পাড়ি দিয়ে অনেকেই আসত শুধু কৃতজ্ঞতা জানাতে। যেমন গত বছর কিংবা অনেক বছর আগে ওদের প্রতি মমতা দেখানো হয়েছিল। এদের মধ্যে আছে ষোলো বছরের এক ছেলে। ম্যাগি তার মায়ের চোখের ঘা আর ইনফ্লুয়েঞ্জার চিকিৎসা করার সময় কিছুদিন ওদেরকে থাকতে হয়েছিল করবেটদের সাথে। বেশ কয়েকদিনের পথ পাড়ি দিয়ে ছেলেটা এখানে এসেছে ম্যাগিকে মায়ের ধন্যবাদ আর উপহার হিসাবে কিছু ডালিম পৌঁছে দিতে। তার মা ম্যাগির জন্য নিজ হাতে ডালিমগুলো পেড়ে দিয়েছে। আর এক তালি দেয়া ধুতি পরা সেই লোকটা এখানে আসার ঘণ্টাখানেক আগে একজন বৃদ্ধ বাংলোর সিঁড়ি বেয়ে উঠে বারান্দার একটা খামে হেলান দিয়ে বসল। কিছুক্ষণ করবেটের দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা নাড়তে নাড়তে হতাশ হয়ে সে বলল, "সাহেব, শেষবার যখন দেখেছিলাম তার চেয়ে তোমাকে এখন অনেক বুড়ো দেখাচ্ছে।"

"হ্যাঁ, দশ বছর পর যে কাউকে আগের চেয়ে বৃদ্ধ দেখাবে, সেটাই স্বাভাবিক।" উত্তর দিলেন করবেট।

"না সাহেব, সবাই না।" লোকটা প্রতিবাদ করল, "দশ বছর নয়, বারো বছর আগে যখন শেষবার তোমার এই বারান্দায় বসেছিলাম, তার চেয়ে দেখতে কিংবা মনের দিক থেকে আমি বেশি বুড়ো হইনি। সেবার বদ্রীনাথে এক তীর্থযাত্রা শেষে পায়ে হেঁটে ফেরার সময় তোমার বাড়ির গেটটা যখন দেখতে পাই, তখন আমি ছিলাম প্রচণ্ড ক্লান্ত। বিশ্রাম এবং অর্থের খুব প্রয়োজন ছিল। আমি তোমার কাছে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার অনুমতি আর কিছু টাকা চেয়েছিলাম।

"এবার এসেছি পবিত্র কৈলাস পর্বত থেকে। তবে এবার আমার টাকার প্রয়োজন নেই। আজ শুধু এসেছি সেদিনের সেই সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ দিতে আর আমি ঠিকমতই বাড়ি পৌঁছেছিলাম তা জানাতে। সেবার কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর হলদোয়ানিতে পরিবারের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য রওনা হই।"

হলদোয়ানি এখান থেকে চোদ্দ মাইল দূরে। যদিও সে মনে করে, চেহারা আর মনের দিক থেকে তার বয়স বাড়েনি, তবে তাকে দেখে অথর্ব এক বৃদ্ধ ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে না।

এই মুহূর্তে সেই তালি দেওয়া ধুতির পরা লোকটার চেহারাটা পরিচিত মনে হচ্ছে। তবে তার নাম কিংবা শেষবার কী উদ্দেশ্যে সে এসেছিল তা কোনভাবেই তাঁরা মনে করতে পারলেন না। তাঁরা ওকে এখনও চিনতে পারেননি বুঝতে পেরে লোকটা গায়ের কোট আর জামাটা খুলে ফেলল। তার ডান কাঁধের দিকে তাকাতেই সাথে সাথে তাকে চিনে ফেললেন করবেট আর ম্যাগি। ও নাথুরাম, মুড়ি বিক্রি করত। তবে তাকে চিনতে না পারার কয়েকটা কারণ আছে। ছয় বছর আগে যখন করবেটরা তাকে দেখেছিলেন, তখন তার শরীরে হাড় আর

www.BanglaBook.org

চামড়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না। প্রচণ্ড কষ্ট করে তাকে পা টেনে টেনে লাঠি নিয়ে হাঁটতে হত। আর ওর কাঁধের ভাঙা হাড়গুলো পুরোপুরি ঠিকভাবে জোড়া না লাগলেও এখন আর কোনও সমস্যা নেই। যদিও কাঁধটা কিছুটা বিকৃত দেখাচ্ছে। বুকের চামড়া কিছুটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, আর তার ডান হাতটা কিছুটা শুকনো। যাঁরা তাকে তিনমাস ধরে মৃত্যুর সাথে বীরের মত লড়ে যেতে দেখেছেন, তাঁরা আজ রীতিমত বিস্মিত। করবেটরা যাতে আরও খুশী হন, সেজন্য নিজের বাঁ হাতটা বার বার উপর নীচ করে আর আঙুলগুলো খুলে আর বন্ধ করে দেখিয়ে নরোয়া। জানাল তার হাত দিনে দিনে আরও সবল হয়ে উঠছে। সেদিন তাঁরা ভেবেছিলেন আঙুলগুলো অনড় হয়ে যেতে পারে। সে এখন আবার কাজ করতে পারছে। নরোয়া বলল, সে যে আগের চেয়ে এখন অনেক ভাল আছে তা করবেটদের দেখাতে এবং ম্যাগিকে ধন্যবাদ জানাতেই আজ তার এখানে আসা। ম্যাগির পায়ের উপর নিজের মাথা রেখে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগল। ম্যাগির প্রতি তার এই ভক্তির কারণ নরোয়া যতদিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছিল ততদিন তার পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা করে ম্যাগিই তাদের বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

**নরোয়ার গল্প**

নরোয়া আর হরিয়া রক্ত সম্পর্কে ভাই নয়। যদিও তারা নিজেদের পরস্পরের আপন ভাই হিসাবেই পরিচয় দেয়। আলমোড়ার কাছাকাছি একটা গ্রামে তাদের জন্ম; শৈশবও কেটেছে ওখানে। বড় হওয়ার পর দু'জনেই বেছে নিয়েছে ঝুড়ি তৈরির কাজ। ভারতে তখন ঝুড়ি তৈরি করত কেবল নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা। গরমকালে নরোয়া আর হরিয়া তাদের গ্রামে ঝুড়ি তৈরি আর খেত খামারের কাজ করত। আর শীতের সময়টায় চলে আসত কালাধুঙ্গিতে, যেখানে বড় ঝুড়ির প্রচণ্ড চাহিদা ছিল। এখানকার গ্রামবাসীদের জন্য তারা যে বিশাল বিশাল ঝুড়ি তৈরি করত তার কোন কোনটা পনেরো ফুট পর্যন্ত হত। তাদের পাহাড়ী গ্রামে তারা ঝুড়ি তৈরি করে রিংগাল দিয়ে; চিকন এই বাঁশগুলো বিশ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। এই বাঁশগুলো দিয়ে সব ধরনের চমৎকার জিনিস তৈরি করা যায়। তবে কালাধুঙ্গিতে তারা বাঁশ ব্যবহার করে মজবুত ঝুড়ি তৈরির জন্য।

কালাধুঙ্গিতে বাঁশ জন্মে সরকারী মালিকানায় সংরক্ষিত বনাঞ্চলে। সংরক্ষিত বনের পাশে যাদের চাষের জমি আছে তাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য বাঁশ কাটার অনুমতি আছে। প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বাঁশ তারা কাটতে পারে।

তবে ব্যবসার জন্য যারা বাঁশ ব্যবহার করে তাদের স্থানীয় বনরক্ষীর কাছ থেকে লাইসেন্স করিয়ে নিতে হয়। প্রতি বোঝা বাঁশের জন্য সরকারকে দুই আনা করে টাকা দিতে হয়। লাইসেন্স করিয়ে দেয়ার জন্য বনরক্ষীকে কিছু টাকাও দিতে

www.BanglaBook.org

হয়। লাইসেন্সটা যার নামে শুধু সে-ই ব্যবহার করতে পারে সেটা। আর প্রত্যেক বোঝার জন্য আলাদা লাইসেন্স করতে হয়। ঝুড়ি তৈরির জন্য দুই বছর বয়সী বাঁশই সবচেয়ে উপযোগী।

১৯৩৯-এর ২৬ ডিসেম্বর এক ভোরে নরোয়া আর হারিয়া আট মাইল হেঁটে নালনি গ্রামে পৌঁছেন। সেখানে বনরক্ষীর কাছ থেকে দু'জন দুটো লাইসেন্স করিয়ে জঙ্গলে চলে আসল বাঁশ কাটতে। সারা দিন বাঁশ কেটে সন্ধ্যায় দুই বোঝা বাঁশ সাথে নিয়ে কালাধুঙ্গির ফিরতি পথ ধরল তারা। যখন রওনা হলো তখন ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে। ঠাণ্ডা থেকে বাঁচতে দুজনেই মোটা সুতীর কাপড় গায়ে জড়িয়ে নিল।

প্রথম মাইলখানেক রাস্তা একটা নালার কিনার ধরে এগিয়েছে। তারপর নালার উপরের এক সাধি উঁচু পাহাড় পার হয়ে একটা পায়ে চলা পথে এসে পৌঁছল তারা। রাস্তাটা কখনও ঘন ঝোপের ভিতর দিয়ে আবার কখনও পাহাড়ী নদী তীরের ছড়ানো ছিটানো পাথরের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। নদী তীরের এই পাথুরে জমিটায় সকালের দিকে প্রায়ই এক জোড়া ভোঁদড় দেখা যায়। আর এখানে সূর্যের আলো যখন নদীর পানিতে খেলা করে, তখন বড়শি দিয়ে তিন-চার পাউন্ড ওজনের মাছও ধরে ফেলা সম্ভব। আরও দুই মাইলের মত উপরে উঠে একটা অগভীর জায়গা দিয়ে নদী পার হয়ে দু'জনে। তারপর তীরের বড় গাছ আর ঘাসের জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সকালে ও সন্ধ্যায় চিত্রল আর সম্বরের অনেকগুলো পাল এখানে চরে বেড়ায়। কখনও কখনও কাঁকর, চিতাবাঘ কিংবা বাঘও দেখা যায়। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে মাইলখানেক এগিয়ে এমন একটা জায়গায় চলে আসল যেখানে কয়েকটা পাহাড় মিলিত হয়েছে। এই জায়গাতেই বেশ কয়েক বছর আগে করবেটের প্রিয় কুকুর পাওয়ালগড়ের কুমার বাহাদুরের পায়ের ছাপ খুঁজে পেয়েছিল। এখান থেকেই বিশাল বিস্তৃত উপত্যকার শুরু। রাখাল বা চোরা শিকারী, সবার কাছেই জায়গাটা সমান পরিচিত। এই উপত্যকায় এগুতে হয় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে। কারণ পায়ে চলা পথটাতে মানুষ আর বাঘ, সবাই যাওয়া-আসা করে।

উপত্যকার উপরের দিকে পাহাড় বেয়ে ওঠার আগে রাস্তাটা আট ফুট উঁচু ঘাসের জমির ভিতর দিয়ে চলে গেছে। রাস্তার দু'পাশে জঙ্গলের বিস্তার পঞ্চাশ গজের মত। ঘাসের জমিটায় পৌঁছাবার ঠিক আগে নরোয়া তার শরীরে জড়ানো মোটা কাপড়টা খুলে নিয়ে ভাঁজ করে ডান কাঁধের উপর চাপাল। হারিয়া সামনে এগিয়ে গেল, আর নরোয়া কয়েক ফুট দূরত্বে তার পিছন পিছন চলতে লাগল। ঘাসের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে মাত্র তিন কি চার গজ এগিয়েছে এমন সময় হারিয়া বাঘের হুঙ্কার শুনতে পেল, একই সাথে নরোয়ার তীক্ষ্ণ চিৎকার কানে আসল তার। ঘুরে দ্রুত পিছনে দৌড়ে আসতেই দেখল জঙ্গলের কিনারে খোলা জায়গাটায় নরোয়ার পিঠের উপর চেপে বসেছে একটা বাঘ। ছুটে কাছে এসে বাঘটার নীচ

www.BanglaBook.org

থেকে তাকে বের করে আনার জন্য দু'হাত দিয়ে তার এক পায়ের গোড়ালি চেপে ধরে টানতে শুরু করল হারিয়া। টান শুরু করতেই বাঘটা উঠে দাঁড়িয়ে তার দিকে ঘুরে গর্জন করতে লাগল। নরোয়ার দেহটা নিজের পিঠের উপর তুলে কিছুটা দূরে এসে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তাকে নিজের পায়ের উপর বসিয়ে দিল হারিয়া। কিছুক্ষণ পর হাত ধরে দাঁড় করিয়ে হাঁটতে চেষ্টা করল নরোয়াকে। কিন্তু নরোয়া মারাত্মকভাবে আহত হওয়ায় হারিয়ার সে চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো। শেষ পর্যন্ত হারিয়া তাকে জড়িয়ে ধরে কখনও টেনে কখনও কোলে নিয়ে ঘাসের কিনারার খোলা জায়গাটা পার হয়ে এল। তারপর আবার কালাধুঙ্গির রাস্তায় উঠে আসল। এদিকে বাঘটা তখনও গর্জন করে চলেছে। অমানুষিক পরিশ্রম করে শেষ পর্যন্ত ভাইকে কালাধুঙ্গিতে করবেটদের বাংলো পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারল হারিয়া। নরোয়ার কাঁধে জড়ানো মোটা কাপড়টা থাকা সত্ত্বেও বাঘটা তার কাঁধের হাড় গুঁড়ো করে দিয়েছে, বুকের ডান পাশ আর পিঠের মাংস খুবলে হাড় বের করে ফেলেছে। আবার যাতে বাঘটার মুখোমুখি হতে না হয় সে জন্য মুসাবাঙ্গ গ্রামের ভিতর দিয়ে একটা ঘুরপথ ধরে এসেছে হারিয়া। ঘুর পথে আসবার জন্য অতিরিক্ত দশ মাইল পাড়ি দিতে হয়েছিল ওদের। আর সে জন্য দুই রুপী দিয়ে একটা বাচ্চা ঘোড়া ভাড়া করতে হলো হারিয়াকে। কোন স্যাডল না পেয়ে থলের উপর বসাতে হয়েছিল নরোয়াকে। প্রথম ছয় মাইল রাস্তা ছিল প্রচণ্ড দুর্গম।

রক্তে প্রায় গোসল করা নরোয়াকে নিয়ে হারিয়া যখন বাংলোর সামনে পৌঁছল, ম্যাগি তখন বারান্দায় বসে চা খাচ্ছেন। ভালভাবে একবার দেখেই তিনি বুঝে গেলেন পরিস্থিতি তাঁর আওতার বাইরে। তাই দ্রুত একটা সাল ভলেটাইজার ডোজ দিয়ে দিলেন তাকে, কারণ যে কোন মুহূর্তে সে জ্ঞান হারাতে পারে। তাড়াতাড়ি তার হাতের জন্য একটা স্লিং তৈরি করলেন আর ব্যান্ডেজ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য একটা বিছানার চাদর ছিঁড়ে নিলেন। তারপর হাসপাতালে ভর্তি করার জন্য আর যতটা সম্ভব সহযোগিতা করার অনুরোধ করে কালাধুঙ্গি হাসপাতালের সহকারী সার্জনকে একটা চিঠি লিখে দিলেন। করবেটদের স্কুলের সেরা ছাত্রটির হাতে চিঠিটা দিয়ে তার সাথে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন ওদের।

করবেট সেদিন তার কয়েকজন বন্ধুর সাথে বাইরে পাখি শিকারে গিয়েছিলেন। বন্ধুরা কালাধুঙ্গিতে এসেছিলেন বড়দিনের ছুটি কাটাতে। সন্ধ্যায় ফিরে এসে নরোয়ার ঘটনা জানলেন ম্যাগির কাছ থেকে। পরদিন সকালে হাসপাতালে আসলেন করবেট। সেখানে একেবারে অনভিজ্ঞ, তরুণ একজন ডাক্তার তাকে জানাল নরোয়ার জন্য তার পক্ষে যতটা করা সম্ভব তা করেছে সে। কিন্তু নরোয়ার সুস্থ হবার সম্ভাবনা খুবই কম। আর হাসপাতালে রোগীদের খাবার কোন ব্যবস্থা না থাকায় প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

নরোয়া তাদের সম্প্রদায়ের যে বিশাল আকৃতির বারোয়ারি কুঁড়েতে থাকে,

www.BanglaBook.org

তাতে অসংখ্য বাচ্চা কাচ্চা সহ বিশটা পরিবার বাস করে। জায়গাটা প্রচণ্ড অস্বাস্থ্যকর আর কোলাহলে পূর্ণ। সেখানেই এক কোণে খড়ের বিছানায় তাকে পড়ে থাকতে দেখলেন করবেট। নরোয়ার মত প্রচণ্ড অসুস্থ একজন মানুষের জন্য এর চেয়ে ভয়াবহ জায়গা আর হতে পারে না। ইতোমধ্যেই তার ক্ষতগুলোয় পচন ধরতে শুরু করেছে। অন্য কোন জায়গা না থাকায় পুরো একটা সপ্তাহ নরোয়াকে এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাটাতে হলো। কখনও তার প্রচণ্ড জ্বর উঠল, আবার কোনও সময় সে জ্ঞান হারাল। তবে পুরো সময়টাই তার স্ত্রী, ভাই হারিয়া আর অন্য বন্ধু-বান্ধবেরা নরোয়ার দেখাশোনা করল। কিন্তু অনভিজ্ঞ করবেটও বুঝতে পারল, নরোয়ার ব্যান্ডেজ খুলে ঘা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা না করা গেলে শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচানো যাবে না। তাই তার দেখাশোনার একটা ব্যবস্থা করে তিনি তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিলেন। সেই তরুণ ডাক্তারই আবার নরোয়ার চিকিৎসার দায়িত্ব নিল। নরোয়ার ঘা পরিষ্কারের সময় সে এমনভাবে ছুরিটা চালাল যে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বেচারা নরোয়াকে বাঘের আঁচড় ছাড়াও ডাক্তারের ছুরিরও কিছু ক্ষত নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে।

ভিক্ষুকদের কথা বাদ দিলে ভারতের গরীব লোকদের কপালে খাবার জোটে কেবল তারা কাজ করলে। নরোয়ার স্ত্রীকে তিন বছরের একটা মেয়ে ছাড়াও আরও ছোট্ট একটা বাচ্চার দেখাশোনা করে হাসপাতালে যাওয়া-আসা করতে হত। তাতে তার কাজ করার কোনও সুযোগ থাকত না। পরে যখন নরোয়াকে তাদের কুঁড়েতে নিয়ে আসা হয় তখনও রোগীর সেবা আর বাচ্চাদের দেখাশোনা করতে সারাটা দিন তাকে প্রচণ্ড ব্যস্ত সময় কাটাতে হত। তাই—ওই সময়টায় নরোয়া আর তার পরিবারের খাবার থেকে আরম্ভ করে প্রয়োজনীয় সব কিছুর ব্যবস্থা করেছিলেন করবেটের বোন ম্যাগি। তিন মাস পর করবেটদের কাছ থেকে গোঁড়াতে গোঁড়াতে বিদায় নিতে আসল নরোয়া। তখন তার চামড়া কুঁচকে গেছে। ডান হাতটা দেখে মনে হয় না সেটা আর কখনও ব্যবহার করতে পারবে সে। পরের দিনই নরোয়া আর হারিয়া পরিবার সহ আলমোড়ার কাছে তাদের গ্রামের বাড়িতে রওয়ানা হলো।

দুর্ঘটনার দিন যে রাস্তায় দুই ভাই আক্রান্ত হয়েছিল বাঘটাকে মারার জন্য আবার সে পথে হাঁটতে শুরু করেন করবেট। তারা দুজন এই জায়গাটায় পৌঁছার একটু আগে বাঘটা একটা মদ্দা সম্বর মেরে পথের ডান পাশের ঘাসের জঙ্গলের ভিতর নিয়ে আসে। এদিকে হারিয়া ঘাসের ভিতর ঢুকতেই বাঘটা শব্দ পেয়ে বের হয়ে আসে আর হারিয়ার কয়েক গজ পিছনে বাঁকটার কাছাকাছি নরোয়ার দিকে ছুটতে শুরু করে; আর ঘটনাটি ঘটে যায় দুর্ঘটনাবশতই। কারণ নরোয়ার গায়ের উপর পড়ে যাওয়ার আগে লম্বা আর ঘন ঘাসের জন্য বাঘটা তাকে দেখতেই পায়নি। আসলে বাঘটা নরোয়াকে আক্রমণের কোনও চেষ্টাই করেনি, এমনকী হারিয়া যখন তার ভাইকে নীচ থেকে টেনে বের করে নেয় তখনও কোন রকম

www.BanglaBook.org

বাধা দেয়নি। কাজেই এটাকে না মারার সিদ্ধান্ত নিলেন করবেট। পরবর্তীতে তাঁর 'ম্যান ইটারস অভ কুমায়ুন' বইতে 'ন্যায়পরায়ণ বাঘের' অধ্যায়ে অন্য কয়েকটা বাঘের সাথে এই বিশেষ বাঘটার কথাও উল্লেখ করেছেন।

প্রচণ্ড সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, এমন যে ক'টা ঘটনার কথা করবেট জানেন, তারমধ্যে নরোয়াকে উদ্ধারের ঘটনাটাই শ্রেষ্ঠ। জঙ্গলের ভিতর একা কোন ধরনের অস্ত্র ছাড়া একটা প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ বাঘের নীচ থেকে সঙ্গীকে টেনে বের করে আনা, নিঃসন্দেহে একজন মানুষের প্রচণ্ড সাহসিকতার কথা জানান দেয়। মারাত্মক আহত একজনকে সঙ্গে নিয়ে দুই মাইল দুর্গম পাহাড়ী পথ পাড়ি দিতে হয়েছিল এমন একজায়গায় প্রতি মুহূর্তে যেখানে পিছন থেকে আবারও আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল। হারিয়ার কাছ থেকে পুরো ঘটনার যে বর্ণনা করবেট শুনেছেন, পরবর্তীতে নরোয়াও ঠিক সে কথাই জানিয়েছে। হারিয়ার অসামান্য এই অসমসাহসিক কৃতিত্বের কথা শুধু লিখে রাখার জন্যই তিনি নরোয়ার কাছে জানতে চেয়েছেন।

তবে হারিয়া একবারও ভাবেনি, সে বিরাট কিছু করেছে। বরং করবেটের প্রশ্নের জবাবে এক পর্যায়ে সে বলে, 'সাহেব, আমি কি এমন কিছু করে ফেলেছি, যাতে আমাকে আর নরোয়াকে সমস্যায় পড়তে হবে?' এমনকী কিছুদিন পর করবেট যখন নরোয়ার কাছে এ-ব্যাপারে জানতে চান তখন ভাই-এর অমঙ্গল হতে পারে ভেবে সে-ও বেশ চিন্তায় পড়ে যায়। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সে বলে, 'সাহেব, আমার ভাইকে আবার কোনও বিপদে ফেলে দিও না যেন। বাঘটা যে আমাকে আক্রমণ করেছে এতে তার কোনও দোষ নেই। সে শুধু আমাকে বাঁচানোর জন্য এ-কাজ করেছে।'

হারিয়ার অসামান্য সাহসিকতা, আর নরোয়ার মৃত্যুর সাথে হার না মানা লড়াইয়ের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করার একান্ত ইচ্ছা ছিল করবেটের মনে। কারণ তারা দুজনেই ছিল খুব গরীব। কিন্তু দুঃখজনকভাবে লাল ফিতার দৌরাত্ম্যে কাজটা করা করবেটের জন্য ছিল অত্যন্ত কঠিন।

ইতিহাসের এই অসামান্য সাহসিকতার ঘটনা শুধুমাত্র নিরপেক্ষ সাক্ষী না থাকার কারণে কোনও ধরনের সরকারী স্বীকৃতি পেল না। দুই ভাইয়ের মধ্যে হারিয়াই বেশি দুর্ভাগা, কারণ এই দুঃসাহসী কাজের প্রমাণ হিসাবে দেখানোর মত কোনও প্রমাণই তার হাতে ছিল না। সেদিক থেকে নরোয়া ভাগ্যবান, তার শরীরের অসংখ্য ক্ষত আর রক্তমাখা সেই মোটা কাপড়টা দিয়ে অন্তত তার পক্ষে প্রমাণ দেখানো যেত অনেক দিন ধরেই করবেট বিষয়টা মহামান্য রাজার কানে তোলার কথা চিন্তা করেছেন। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় সে সুযোগ আর তিনি কোনদিন পাননি।

---

www.BanglaBook.org

## লালফিতার যুগের আগে

এক শীতে এণ্ডারসনের (শিকারী এণ্ডারসন নন) সঙ্গে তেরাইয়ে ক্যাম্প করেছিলেন করবেট। হিমালয়ের পাদদেশে ক্রমেই ঢালু হয়ে নেমে গেছে এলাকাটা। জানুয়ারির শুরুর এক সকালে নাস্তা শেষে বিন্দুখেরা ছাড়লেন দুজনে তারপর বিন্দুখেরা থেকে তাঁদের পরবর্তী ক্যাম্পিংয়ের স্থান বক্সারে যাওয়ার ঘুর পথটা ধরলেন । উদ্দেশ্য তাঁবু খাটানোর জন্য নিজেদের লোকজনের একটু বাড়তি সময় পাইয়ে দেয়া :

বিন্দুখেরা থেকে বক্সার যাওয়ার পথে সেতু নেই এমন দুটো নদী অতিক্রম করতে হয়। আর দ্বিতীয় নদীটি পার হওয়ার সময় করবেটদের তাঁবু বহন করা উটগুলোর একটি পিছলে পড়ে গেল। সেই সঙ্গে তার বোঝাগুলোও পানিতে ফেলে দিল। এতে বেশ কিছুটা দেরি হয়ে গেল। ফলে ঘুরপথে এসে এমনকী পথে আয়েস করে চমৎকার কিছু কালো তিতির শিকারের পরও বক্সার এসে দেখলেন তাঁদের জিনিসপত্র তখনও উটের পিঠ থেকেই নামানো হয়নি।

করবেটদের ক্যাম্পের জায়গাটা বক্সার গ্রাম থেকে মাত্র কয়েকশ' গজ দূরে। আর যেহেতু এণ্ডারসনের আগমন বিশেষ একটি উপলক্ষ তাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আর তাঁদের তাঁবু খাটাতে যে কোন ধরনের সাহায্য করতে প্রায় গোটা গ্রামের লোকজন এসে হাজির হয়ে গেল এখানে।

সার ফ্রেডরিক এণ্ডারসন এসময় ছিলেন তেরাই আর ভাবার রাজ্যের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট। অসাধারণ দয়ালু আচরণের কারণে তাঁর আওতার মধ্যে পরে এমন কয়েক হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে জাত-গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন এণ্ডারসন এই দয়ালু প্রকৃতির বাইরে তিনি ছিলেন চমৎকার একজন প্রশাসক। আর তাঁর ছিল অসাধারণ স্মরণশক্তি, যা এর আগে করবেট কেবল একজন মানুষের মধ্যেই দেখেছেন। তিনি জেনারেল সার হেনেরি রামসে, যিনি ২৮ বছর একই এলাকায় দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর কাজের সময় গোটা কুমায়ুন এলাকার মুকুটহীন সম্রাট হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠেন তিনি। রামসে এবং এণ্ডারসন দুজনেই জাতিতে স্কটিশ। বলা হত একবার যাঁর নাম শুনেছেন কিংবা চেহারা দেখেছেন কখনও তা ভুলতেন না তাঁদের কেউ। সাধারণ অশিক্ষিত মানুষদের নিয়ে কাজ করেছেন এমন হাতে গোনা কিছু মানুষই কেবল ভাল স্মরণ শক্তির মূল্য বুঝবেন ; একজন নিগৃহীত মানুষের কাছে তার নাম

www.BanglaBook.org

মনে রাখা কিংবা সে আগে যে কাজে এসেছিল তা মনে রাখার চেয়ে বড় আর কিছু হতে পারে না।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উত্থান আর পতনের ইতিহাস লেখার সময় ব্রিটিশ রাজের পতনের পিছনে লাল ফিতারা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তা বিবেচনায় এসেছে। রামসে এবং এণ্ডারসন দুজনেই এমন সময় ভারতে কাজ করেছেন যখন লাল ফিতাদের কথা কেউ জানত না। আর তাঁদের জনপ্রিয়তা আর দায়িত্ব পালনে সফল হওয়ার অন্যতম কারণ তাঁদের হাত এতে বাঁধা পড়েনি।

কুমায়ুনের বিচারকের দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি রামসে একই সঙ্গে ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, বন কর্মকর্তা এবং প্রকৌশলী। যেহেতু তাঁর কাজগুলো বিভিন্ন ধরনের আর কষ্টসাধ্য, তাই এর অনেকগুলোই তিনি করতেন এক ক্যাম্প থেকে আরেক ক্যাম্পে হেঁটে যাবার সময়। এই দীর্ঘ হাঁটা পথে বেশ কিছু লোকের উপস্থিতিতে সব ধরনের মামলার সমাধান করাই ছিল তাঁর স্বভাব প্রথমে শোনা হয় বাদী আর তার সঙ্গীদের বক্তব্য। তারপরে বিবাদী এবং তার সঙ্গীদের বক্তব্য। তারপর বিষয়টি নিয়ে কিছুটা সময় আলাপ-আলোচনার পর বিচারের রায় ঘোষণা করতেন রামসে। হতে পারত তা অর্থ দণ্ড কিংবা কারাদণ্ড। আর জানা মতে কখনোই তাঁর রায় নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলেনি। ঠিক তেমনি তাঁর দেয়া জরিমানা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছে এমন লোক যেমন খুঁজে পাওয়া যাবে না, তেমনি পাওয়া যাবে না তাঁর দেয়া সাধারণ কিংবা সশ্রম কারাবরণ মেনে নিয়ে কাছের কারাগারে নিজেকে সমর্পণ করেননি এমন মানুষ। তেরাই এবং ভাবার এলাকার তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে তাঁর পূর্বসূরী রামসেকে যে কাজ করতে হত তার কেবল একটি অংশ করতে হত এণ্ডারসনকে। কিন্তু তাঁর প্রশাসনিক ক্ষমতা কোন অংশেই রামসে থেকে কম ছিল না।

ভো সেদিন বিকালে তাঁদের তাঁবু বক্সারের ক্যাম্প করার জায়গাটায় বসানো হয়ে গেলে উপস্থিত লোকদের বসতে বললেন এণ্ডারসন। তারপর জানালেন তাদের যে কোন ধরনের অভিযোগ কিংবা আবেদন শুনতে তিনি এখন প্রস্তুত।

প্রথম আবেদনটি এল বক্সারের পার্শ্ববর্তী গ্রামের হেডম্যানের কাছ থেকে। তার কথা থেকে জানা গেল একটি মাত্র নালার উপর দুই গাঁয়ের চাষ-বাস নির্ভর করে। আর নালাটি বয়ে গেছে বক্সারের ভিতর দিয়ে। এবার মৌসুমি বৃষ্টিপাতের স্বল্পতার কারণে নালার পানির পরিমাণ দুটো গ্রামের জন্য যথেষ্ট ছিল না। ফলে কেবল বক্সারের লোকেরাই এটি ব্যবহার করেছে। আর এতে করে নীচের গ্রামটির সব শস্য পানির অভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। বক্সারের হেডম্যান স্বীকার করল নালা পথে একটু পানিও নীচের গ্রামটিতে যেতে দেয়নি তারা। কারণ যদি এই অল্প পানি ভাগাভাগি করা হত তবে দুই গ্রামের সমস্ত শস্যই নষ্ট হয়ে যেত। শস্য সংগ্রহ এবং মাড়াইয়ের কাজ করা হয়েছে করবেটরা এখানে পৌঁছার কয়েকদিন

www.BanglaBook.org

আগে। এখন দুই হেডম্যানের বক্তব্য শোনার পর এণ্ডারসন সমস্ত শস্য একত্র হিসাবে দুই গ্রামের মধ্যে ভাগ করে নেয়ার নির্দেশ দিলেন। বক্সারের লোকেরা রায়টি মেনে নিল। তবে ফসলগুলো সংগ্রহ আর মাড়াইয়ের পরিশ্রম বাবদ তাদের পাওনা দাবি করে বসল তারা। এবার নীচের গ্রামের লোকেরা পাল্টা যুক্তি দেখাল ফসল সংগ্রহ আর মাড়াইয়ের সময় তাদের কোন ধরনের সাহায্য চায়নি প্রতিবেশী গ্রামের লোকেরা। অতএব বক্সারের দাবি প্রত্যাখ্যান করলেন এণ্ডারসন। এখন দুই গ্রামের হেডম্যান যখন শস্য ভাগাভাগি করতে গেল, দ্বিতীয় অভিযোগ পেশ করা হলো তাঁর সামনে।

এটা এল চাদির কাছ থেকে। কালুকে তার স্ত্রী তিলনিকে জোর করে তুলে নেয়ার জন্য অভিযুক্ত করে সে। তার দাবি, সপ্তাহ তিনেক আগে প্রথম তিলনির সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করে কালু। চাদির বাধা সত্ত্বেও চেষ্টা চালিয়ে যায় সে। আর এতে করে এক পর্যায়ে চাদির ঘর ছেড়ে গিয়ে কালুর বাড়িতে ওঠে তিলনি। এণ্ডারসন যখন জিজ্ঞেস করলেন কালু কি এখানে উপস্থিত আছে তখন করবেটদের সামনের অর্ধবৃত্তাকার জায়গাটার কিনারা থেকে একজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে জানাল সেই কালু।

শস্য নিয়ে বিবাদটি যখন চলছিল তখন জড়ো হওয়া মহিলা আর মেয়েরা এর প্রতি সামান্যই আগ্রহ দেখিয়েছিল। কারণ এটি তাদের পুরুষদের ব্যাপার। কিন্তু এখন তাদের মুখের ভাব আর জোরে নিঃশ্বাস পতনের শব্দ জানিয়ে দিচ্ছে এই মামলাটি তাদের সকলকেই আগ্রহী করে তুলেছে।

এণ্ডারসন যখন কালুকে জিজ্ঞেস করলেন চাদি যে অভিযোগ এনেছে তা সত্যি কিনা তখন কালু স্বীকার করল তিলনির জন্য যে কুঁড়েটির ব্যবস্থা সে (কালু) করেছে এখন তাতেই থাকছে মেয়েটা। তবে তাকে জোর করে ভাগিয়ে আনার অভিযোগ অস্বীকার করল। এবার সে কি তিলনির আইনসম্মত স্বামী চাদির কাছে ফিরিয়ে দিতে রাজি আছে কিনা জানতে চাওয়া হলো। কালু জবাব দিল তিলনি নিজের ইচ্ছায় তার কাছে এসেছে, এখন তাকে চাদির কাছে ফিরে যেতে বাধ্য করতে পারে না সে। তিলনি এখানে উপস্থিত আছে কিনা এবার তা জানতে চাইলেন এণ্ডারসন। নারীদের দলটির মধ্য থেকে একটি মেয়ে এগিয়ে এসে বলল, 'আমিই তিলনি। মহানুভব আমার কাছে কী জানতে চান?'

তিলনি হালকা-পাতলা গড়নের চমৎকার চেহারার বছর আঠারোর একটি মেয়ে। সাদা পাড়ের একটা কালো শাড়ির উপর দিয়ে পা পর্যন্ত নেমে এসেছে তার লম্বা চুলগুলো। শরীরের উপরের অংশ আবৃত একটা আঁটসাঁট লাল ব্লাউজ দিয়ে; বড়, ঢোলা রঙচঙে একটা স্কার্ট তার পরনে। এণ্ডারসন যখন জানতে চাইলেন কেন সে তার স্বামীকে ছেড়ে এসেছে, তখন চাদির দিকে নির্দেশ করে বলে উঠল, 'তার দিকে তাকান। আপনি যা দেখছেন সে কেবল নোংরাই নয় সে

www.BanglaBook.org

একজন প্রচণ্ড কৃপণ স্বভাবের মানুষ। বিয়ের পর গত দুই বছরে আমাকে একটা কাপড় এমনকী একটা অলংকারও দেয়নি সে এই কাপড় যেগুলো আপনি দেখছেন এবং এই অলংকারগুলো,' বলে তার হাতের রুপার চুড়ি আর গলার পুঁতির মালাগুলোর দিকে নির্দেশ করল, 'আমাকে দিয়েছে কালু।' যখন জিজ্ঞেস করা হলো সে আবার চাদির কাছে ফিরে যেতে রাজী আছে কিনা তখন মাথা নাড়িয়ে জানাল কোন কিছুই তাকে এটা করতে বাধ্য করতে পারবে না।

তেরাইয়ের অস্বাস্থ্যকর পাহাড়ি এলাকায় বাস করা এই আদিবাসি গোত্রের মানুষেরা তাদের দুটি বিস্ময়কর গুণের জন্য পরিচিত—এর একটি পরিচ্ছন্নতা, আর অপরটি নারীদের স্বাধীনতা। ভারতের অন্য যে কোন জায়গার কোন গ্রাম কিংবা ছোট বসতি তেরাইয়ের এই গ্রামগুলোর মত এত পরিচ্ছন্ন নয়। আবার ভারতের আর কোন এলাকায় তরুণী একটি মেয়ে এত লোকের মাঝখানে যেখানে আবার দুজন সাদা চামড়ার মানুষ আছে, উপস্থিত হওয়ার সাহস দেখাবে না কিংবা অনুমতিও পাবে না।

এগারসন এবার চাদিকে জিজ্ঞেস করলেন এই পরিস্থিতিতে কি করা যায় এ বিষয়ে তার কোন পরামর্শ আছে কিনা। সে প্রস্তাব দিল, 'আপনি আমার বাবা ও মা। আমি আপনার কাছে এসেছি বিয়ের জন্য। এখন মহামান্য যদি আমার স্ত্রীকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত না হন তবে আমি অন্তত তার জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করব। ক্ষতিপূরণ হিসাবে সে কত চাচ্ছে জানতে চাইলে ১৫০ রুপি দাবি করল কালু। এরপর বৃত্তাকার জায়গাটার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানারকম ফিসফিস মন্তব্য ভেসে আসতে লাগল—সে অতিরিক্ত দাবি করছে, "অনেক বেশি!" সে এটা দিতে পারবে না।'

এগারসন যখন কালুর কাছে জানতে চাইলেন সে কি তিলনির জন্য ১৫০ রুপি দিতে রাজি আছে কিনা তখন সে জানাল চাদি অতিরিক্ত দাবি করছে, কারণ বরবারের সবাই জানে বিয়ের সময় তিলনির জন্য চাদি কেবল ১০০ রুপি দিয়েছিল। আর এটা তিলনির জন্য সে তখন পরিশোধ করেছিল যখন মেয়েটি ছিল নতুন (কুমারী)। এখন তার জন্য সে কেবল ৫০ রুপি পরিশোধ করতে রাজি।

উপস্থিত লোকেরা এবার দুদলে ভাগ হয়ে গেল। কেউ কেউ মন্তব্য করল যে টাকা দাবি করা হয়েছে তা অতিরিক্ত। অন্যরা আবার বলল যা দিতে চাওয়া হয়েছে তা একেবারেই কম। যা হোক বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছু সময় যুক্তি-তর্ক চালানোর সুযোগ দিলেন এগারসন—এই পুরো সময়টি তিলনির মুখে মৃদু একটা হাসি লেগে রইল। শেষ পর্যন্ত তিলনির জন্য চাদিকে ৭৫ রুপি দেবার নির্দেশ দিলেন এগারসন কালুকে। তার কোমরবন্ধ থেকে ছোট্ট একটি চামড়ার থলে বের করে এগারসনের পায়ের কাছে কার্পেটে উপুড় করে দিল সে। গুণে দেখা গেল

www.BanglaBook.org

এখানে ৫২টি রুপার মুদ্রা আছে। যখন কালুর দু'জন বন্ধু এগিয়ে এসে বাকি ২৩ রুপি পূরণ করল, তদিকে টাকাটা গুণে নিতে বললেন এণ্ডারসন। কাজটি করে সে জানাল এখনে ঠিক ৭৫ রুপিই আছে। এসময়ই একটা ঘটনা ঘটল। একটি মহিলাকে কিছু সময় আগে গ্রাম থেকে এদিকে হেঁটে আসতে দেখেন করবেট। মহিলাটি হাঁটছিল খুব আস্তে আস্তে, মনে হচ্ছিল যেন তার প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে। এখানে পৌঁছে অন্যদের চেয়ে একটু দূরে আলাদা হয়ে বসেছিল সে। এবার এই মহিলা বেশ কষ্টে নিজের দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'মহামান্য আমার তবে কী হবে?'

'তুমি কে?' জানতে চাইলেন এণ্ডারসন।

'আমি কালুর স্ত্রী।' জবাব দিল সে।

লম্বা, রোগা একজন মহিলা সে। তার ফ্যাকাসে সাদা মুখ থেকে সমস্ত রক্ত যেন শুষে নিয়েছে কোন এক রক্তচোষা। মারাত্মক প্লীহা ধ্বংস করে দিয়েছে তার দেহের সমস্ত কমনীয়তা। বিশ্রী রকমভাবে ফুলে আছে তার পা দুটো—এসবকিছুই ম্যালেরিয়া নামে তেরাই অঞ্চলের এক ভয়াবহ অভিশাপের লক্ষণ।

ক্লান্ত, মৃদু স্বরে মহিলাটি বলল এখন কালু যেহেতু আরেকজন স্ত্রী কিনে নিয়েছে, তাই সে ঘর হারাল আর যেহেতু গ্রামে তার কোন আত্মীয় নেই আর সে কাজ করার মত সুস্থ নয়, বিনা সেবায় না খেয়ে মরা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না তার। তারপরই শাড়ি দিয়ে নিজের মুখটা ঢেকে নীরবে কাঁদতে লাগল সে। কান্নার দমকে তার শরীর কাঁপতে শুরু করল।

অপ্রত্যাশিত এবং অভাবনীয় এক পরিস্থিতি তৈরি হলো এখানে। এমন এক পরিস্থিতি, যার সমাধান দেয়া এমনকী এণ্ডারসনের জন্যও খুব কঠিন। এদিকে বিষয়টি নিয়ে যখন আলোচনা হচ্ছিল তখন কালুর যে স্ত্রী থাকতে পারে তার বিন্দুমাত্র আভাসও পাননি তিনি।

বেশ কিছুটা সময় নীরব থাকার পর মহিলাদের হা-হুতাসে আবার ভরে উঠল জায়গাটা। তারপরই তিলনি, যে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, কাঁদতে থাকা মহিলাটির কাছে ছুটে গেল। তারপর তার সবল তরুণী হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'কেঁদো না বোন, কেঁদো না। আর বোলো না তোমার বাড়ি নেই। আমার জন্য কালু যে বাড়িটা বানিয়েছে তাতে তোমাকে নিয়ে এক সঙ্গে থাকব আমরা। তোমার যত্ন আর সেবা করব। কালু আমাকে যা দেবে তার অর্ধেক তোমাকে দেব আমি। কাজেই আর কেঁদো না বোন। এখন আমার সঙ্গে চলো, আমি তোমাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি।'

তিলনি আর অসুস্থ স্ত্রী লোকটি চলে যেতেই এণ্ডারসন উঠে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ডভাবে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন পাহাড় থেকে নেমে আসা বাতাসে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগছে তার। আর তাই আজকের মত বিচার শেষ। উপর থেকে নেমে আসা ঠাণ্ডা

www.BanglaBook.org

কালকাকে বজোয় এস্তারসনের মত অন্যদেরও একই সমস্যা তৈরি করছে, কারণ আদালতে তো লড়বার মত টাকা নেই! কিন্তু বিচার আসলে তখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি। এস্তারসনের দিকে এগিয়ে এসে চাদি জানাল তার অভিযোগ সে ফিরিয়ে নিতে চায়। তারপর পকেটে যে ছোট কাপড়ের পুটলিতে ৭৫ রুপি রেখেছিল তা বের করে এনে বলতে শুরু করল, 'কালু এবং আমি একই গ্রামের মানুষ। আর এখন যেহেতু তাকে দুটো মুখের খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে, এর মধ্যে এক জনের আবার বিশেষ খাবারের প্রয়োজন, নিজের সমস্ত টাকাই প্রয়োজন হবে ওর। কাজেই মহামান্য আমাকে তার অর্থ আবার তাকে ফিরিয়ে দেবার অনুমতি দিন।'

লাল ফিতার যুগ শুরু হওয়ার আগে তার সাম্রাজ্য পরিদর্শনের সময় এস্তারসন আর তার পূর্বসূরিরা এটার মত এমন শত-হাজার সমস্যার সমাধান করে মানুষকে তুষ্ট করেছেন। আর এজন্য মামলার বাদী-বিবাদীদের একটা পয়সাও খরচ করতে হয়নি। কিন্তু এখন লাল ফিতার যুগ শুরু হওয়ার পর এ সমস্ত মামলা চলে গেছে আদালতের হাতে। আর মানুষের মধ্যে বিবাদের কারণে দিনকে দিন বেড়েই চলেছে এ ধরনের মামলা। আর এতে আইন পেশার সঙ্গে জড়িত কিছু লোকের হয়েছে পোয়া বারো। অন্য দিকে দরিদ্র, সাধারণ, সৎ আর পরিশ্রমী কৃষকেরা প্রতিনিয়তই হচ্ছে শোষিত, নিপীড়িত।

---